আবর্তন

প্রদোষ সেন

আবর্ত্তন

প্রদোষ সেন

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক —
গ্রন্থকার—
মগবাজার, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ
মে, ১৯৪২ ইং

ঢাকা, জুবিলী প্রেস হইতে
শ্রীমাখনলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

আবর্ত্তন

(১)

সহরের উপকণ্ঠে শেষ প্রান্তে প্রায় আধ মাইল দূরে। স্থানটা না সহর না গ্রাম। প্রথম কয়েকটা ফাঁকা ফাঁকা বাড়ী। তারপর মাঠ আর ঝোপ ঝাড় আর বড়ো বড়ো বাঁশঝাড়। এদিকদিয়ে লোকের চলা-চল বিশেষ নেই বল্‌লেই চলে। মাঝদিয়ে পায়ে-চলা যে কাঁচা পথ চ'লে গেছে দিনের বেলায় দু' চারজনকে মাঝে মাঝে সে পথে দেখা যায়। সন্ধ্যার পর এ—পথে আর লোক চলাচল ক'রতে দেখা যায় না। কারণ সহরের পাকা রাস্তা পেরিয়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় পা পড়লেই নাকি শরীর ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে। মাঠটার মাঝখানে যে-প্রকাণ্ড বটগাছটা, তার কাছদিয়ে সন্ধ্যার পর যাওয়া নাকি বিপদজনক। বহুদিনের সে বটগাছ। ডাল-পালা আর শিকড়জালে মাঠের অনেকটা জায়গা সে দখল করে রেখেছে। গ্রামের বুড়োরাও নাকি ওরকম অবস্থায়ই

সে বটগাছটা দেখেছে। সেটাকে কেন্দ্র করে, নানা রকমের অদ্ভুত গল্প মানুষের মুখে মুখে প্রচার হয়েছে। বটগাছটার নীচে একটা ভাঙ্গা ছোট বাড়ী। দরজা-জানালা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; চূণ বালি দেয়াল থেকে খসে গেছে; কবে ইটে লোনা ধরেছে; কেউ বল্‌তে পারে না। কেউ বলে ভূতের বাড়ী কেউ বলে ডাকাতের আড্ডা। দিনের বেলায়ও সে-বাড়ীতে বেদের দলছাড়া আর কাউকে ঢুক্‌তে দেখা যায় না।

ভূতের ভয়, ডাকাতের ভয়, আর সাপের ভয় মিলে এদিকটা ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে। নেহাৎ ঠেকা না হ'লে এদিকে বড়ো একটা কেউ মাড়ায় না। তা না হ'লে সহরের উপকণ্ঠ ঘেঁসে, এ'দিকটায়ও এতোদিনে লোকালয়ে পূর্ণ হ'য়ে যেতো। কাজেই ঐ আধমাইল জায়গা মাঝখানে রেখে, চারদিক ঘিরে এবড়ো-খেবড়ো ভাবে সহর বেড়ে উঠেছে। ঐ ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদে দাঁড়ালে সহরের বাড়ী, ঘর, গাছ-পালা দেখা যায়; রাত্রে চোখে পড়ে আলোর মেলা, কানে ভেসে আসে কোলাহল—জনতার অবিশ্রান্ত চঞ্চলতা।

কিন্তু এই পরিত্যক্ত স্থানের সন্ধান করে এমন লোকও রয়েছে। তারা ঐতিহাসিক কিম্বা প্রত্নতত্ত্ববিদ নয়। তারা এমন কিছুর সন্ধানে সেখানে এসে আস্তানা নিয়েছে যা, সকল মানুষের চিরকালের কাম্য। তারা বহু লোকের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, সেজন্য বহু লোকের মধ্যে তাদের স্থান নেই। তারা সাধন-ভজনে আত্মসমাহিত নয়, অথচ জীবনের ছোট খাটো ব্যাপার নিয়েও ব্যস্ত নয়—মোক্ষ্য লাভ তাদের উদ্দেশ্য নয়, পরমার্থ লাভও নয়; ভগবান নয়, সাহিত্য নয়, আর্ট নয়,—অতি স্থূল এবং সাধারণ, যা' প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য।

মানুষ পরিত্যক্ত ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটায় অনেক রাত্রে ক্ষীণ-আলো দৈবাৎ কেউ কেউ দেখে। তাতে পড়ো-বাড়ীর মাহাত্ম্য আরও বেড়েছে। বিরাট শক্তির মহিমা পুলিসের অন্তরে বাহিরে। তবু সে অধঃপতিত দেশকে সাপ ও ভূতের ভয় হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেনি। এমন কি নিজেদের পদমর্য্যদাও সে-ভয়কে ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারেনি। কিন্তু ঐ ভাঙ্গাবাড়ীটা যারা বেছে নিয়েছে তাদের পুলিশের ভয় ছাড়া আর কোন ভয় নেই।

মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা। চুপচাপ বসে আছে দশবার জন যুবক। প্রত্যেকের মুখ অসম্ভব গম্ভীর, যেন ঝড়ের আগে আকাশে গুমট বেঁধেছে। একটু বাতাস লাগ্‌লেই, ঝড় উঠ্‌বে। অত্যন্ত ব্যস্ত ও ক্রুদ্ধভাব। সবাই যেন কারো অপেক্ষায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ সে এল। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ যুবক। চোখ কোটরাগত, কিন্তু অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। সে ঘরে প্রবেশ করা মাত্র সকলে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। এমনি থম্ থমে ভাবে কাট্‌ল কিছুক্ষণ। একে অন্যেরদিকে তাকাচ্ছে। একজন আর একজনের শ্বাস প্রশ্বাস যেন শুন্‌তে পাচ্ছে, নিশ্চল স্তব্ধ এতোগুলো জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে মৃত্যু যেন চেপে বসেছে। কেউ হাত পা নাড়তে পারছে না; সবাই অবসন্ন। যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি এসে তাদের জীবনের সমস্ত সচলতা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সবাই যেন এক অনাগত অজ্ঞাত অভিব্যক্তির ভয়ে স্তব্ধ। দেহ-মনের সকল চঞ্চলতা আর জীবনপ্রবাহ দলিত।

সমস্ত জড়তা দূর ক'রে, একজনের কম্পিত কণ্ঠস্বর হ'তে বেরুল "দাদা!" লজ্জা আর ভয়ে, বিকৃত শোনাল সে-ডাক। তার সে দাদা ডাক শুনে ঘরের সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল।

সে আবার বল্‌ল, আজকে অনেক কিছু বলবার আছে আমাদের, অনেক—অনেক অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে।

তারপর আবার সব নীরব হয়ে গেছে। শুধু মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস, আর দূরে ঝিল্লির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

সবাই ভেবেছিল দাদা নিশ্চয়ই এ আক্রমণ বরদাস্ত করবে না। তার কথার ঘুর্ণিপাকে, সকলের যুক্তিতর্ক তলিয়ে যাবে। তাদের ভয় ছিল দাদার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারবে না। মনে মনে অনেকদিন থেকে ক্ষুব্ধ অভিমান জমা হ'য়ে ছিল। প্রকাশ ক'রতে সাহস পায়নি। সে তাদের দাদা—তাদের নেতা; এ পথে সেই তাদের টেনে এনেছে। সমস্ত বাধা, বিঘ্ন, সকল যুক্তি, আত্মীয় পরিজন; আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে—সেই টেনে নিয়ে এসেছে—আদর্শ দিয়েছে, আশা দিয়েছে, মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে এনেছে। এ'তো কাল তারা সৈনিকের মতো তার আদেশ মেনে এসেছে। বিচার করেনি, বুদ্ধি খরচ করেনি—ন্যায় না অন্যায়, লাভ না ক্ষতি দেখেনি। দাদার আদেশই যথেষ্ট, সেইতো অভ্রান্ত সত্য—বেদ বাক্যের মতো নির্ভুল, কঠোর। দাদার আদেশ মান্য করা যেন একটা সংস্কারের মতো হ'য়ে গিয়েছিল। কে কার আগে আত্মবলি দেবে, এই নিয়ে ছিল কাড়াকাড়ি। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, যদিও বা কোন সময় মন বিদ্রোহ ক'রেছে, সংস্কার এসে দাঁড়িয়েছে চোখ রাঙ্গিয়ে—যেমন দাঁড়ায় ধর্ম্মের বিধান, শাস্ত্রের শাসন, সমাজের নিয়ম কানুন। সেখানে বিচার বুদ্ধি সব তলিয়ে যায়। আবাহমান কাল হ'তে এই হ'য়ে আস্‌ছে—এই ভাবে চলেছে; জগতে রয়েছে সভ্যতার বন্ধন—সমাজ—আর সব কিছু।

দাদার আদেশ। আজ ভেঙ্গে গেল সব। দাদার ব্যক্তিত্ব—তার এতোকালের দাদাগিরি, সব চুর্‌মার্‌ হ'য়ে গেল। কোথা থেকে এলো

তার দুর্ব্বলতা, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌লোনা। সকল শক্তি প্রয়োগ ক'রেও সে একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দিতে পারলে না।

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ কাট্‌ল। হঠাৎ দেবেন বল্‌ল, আমরা জান্‌তে চাই, আপনি আমাদের সমিতির বিধান মেনে নিতে রাজী কিনা, যদি না চান, তবে স'রে পড়ুন। নেতার অভাব হবে না আমাদের।

দেবেনের কথা শেষ হ'তে নাহ'তেই আর একজন বল্‌ল, আপনার গতিবিধি অত্যন্ত গর্হিত। আমাদের বিশ্বাস আমাদের সমিতির সাধনা আপনি পণ্ড করে দিচ্ছেন। একটা লোকের দোষে, এতো লোকের সাধনার ফল—আমরা নষ্ট হ'তে দিতে পারিনে। নষ্ট হোতে আমরা দোবোনা।

এ হেন অতর্কিত আক্রমণের জন্য দাদা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। তার মুখদিয়ে আর কোন কথাই বেরুল না—কেবল অস্ফুট স্বরে বল্‌ল, তোমাদের কথা আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—

জবাব দিল দেবেন. তাতো বুঝতে পারবেনইনা। তবে শুনুন— নিজের দোষ, ত্রুটি, কেউ স্বীকার কর্‌তে চায়না। দোষ বুঝেও বুঝতে চায়না। এতোকাল আপনি আমাদের কাছ থেকে দেবতার-ভক্তি আদায় ক'রে নিয়েছেন। আপনি নিয়ম করেছিলেন যে কোন প্রকারেই আমাদের এ সমিতিতে মহিলাদের আনা হবে না। মহিলাদের সংশ্রব সব রকমে ত্যাগ কর্‌তে হ'বে। তাতে যদি আমাদের কর্ম্ম জীবনের গতি ক'মে আসে—আসুক্। কিন্তু আপ্‌নি সে নিয়ম ভেঙ্গেছেন—মেয়েদের টেনেনিয়ে এ'সেছেন। বলুন কি প্রয়োজন ছিল তাদের আন্‌বার? মেয়েরা বাঁধা সৃষ্টিকরা ছাড়া আর কি কর্‌তে পারে? আপনার এ অপরাধের কি শাস্তি নেবেন—আপনি নিজেই বলুন।

দেবেনের কথা শুনে সবাই চমকে উঠ্‌ল। আশ্চর্য্য! দেবেন কি ক'রে দাদাকে অমন শক্ত কথা বল্‌তে পার্‌ল। আবার সব চুপ্‌চাপ্‌। ঘরের আবহাওয়া থম্‌ থমে হ'য়ে উঠ্‌ল। উপস্থিত সকলের বহুদিনের পুঞ্জীভূত মনের-বিষ, শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন বেরিয়ে আস্‌ছিল।

দেবেন আবার বল্‌ল, আজ থেকে আমরা আর আপনার দলভুক্ত নই।

তার মানে! দাদা এবার অসম্ভবরকম ঘাব্‌ড়িয়ে গেল। এর চাইতে দেবেন যদি বল্‌তো—'মৃত্যুর জন্য তুমি প্রস্তুত হও—তাতেও সে অমন অভিভূত হ'তো না। দাদা অম্‌নি তার জামার বোতাম খুলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌তো—"এসো আমি প্রস্তুত" কিন্তু এ যে মৃত্যুর চাইতে ভীষণ। তার দল ভেঙ্গে যাবে, অথচ তাকে বেঁচে থাক্‌তে হবে। চোখের সাম্‌নে সে দেখ্‌বে তার কথা কেউ মান্‌ছে না—দেখ্‌বে তারি হাতেগড়া ছেলেদের নিয়ে আর একজন "লিডারি" কর্‌ছে। তার কি রইল—জীবনের কোন কাজ রইল তার জন্য? ভেঙ্গেগেল তার জীবনের স্বপ্ন—জীবনের আশা—আকাঙ্ক্ষা—দুর্ব্বার ইচ্ছা। সব—সব গেল।

দেবেন আবার ব'ল্‌ল,—আম্‌রা বেশ বুঝতে পার্‌ছি, আপনি গা-ঢাকা দিয়েছেন—এক মাসের মধ্যে আমাদের কাজের কোন programme দেননি। বলুন, কি আপ্‌নার Scheme? এতোগুলো লোকের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের যে-সমিতি গড়ে উঠেছে, তা' কেন আপনি পঙ্গু ক'রে দেবেন? আপনি যোগ দিয়েছেন নারীপ্রগতির দলে। সেদিককার তাল সাম্‌লাতে গিয়ে, আপনি সমিতির ক্ষতি কর্‌ছেন—এমন কি appointment রাখতে

পারেন না। এটা কত বড়ো অন্যায় চিন্তাকরে দেখুন। তোমরা কি বল? এক নিশ্বাসে এতোগুলো কথা বলে দেবেন হাঁপাতে লাগ্‌ল। ঘরের সর্ব্বত্র সবাইরদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কেউ সাড়া দেয় না। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠে নয়নের তারা—আবার নিবে যায়। মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসে গভীর শ্বাস প্রশ্বাস—যেন কোন অতল গহ্বর হ'তে।

তারপর কিছুক্ষণ পরে, দাদা মাথা তু'ল্‌ল। অন্ধকারে যেদিকে অনাথ বসেছিল, সেদিকে চেয়ে বল্‌ল, তুমিও কি এসব বিশ্বাস কর?

এতোগুলো লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত হ'য়ে দুর্ব্বার বেগে ছুটে তাকাল সেদিকে, যেদিকে অনাথ ব'সে ছিল। কিন্তু এল না কোন শব্দ। কিছুক্ষণ যায়, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাড়াল একটী দেহ। একবার সবাইর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাইল—যেন শেষ দেখা—গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, যেমন করে পরিত্যক্ত বৈভবের দিকে তাকায়। ভাব নেই, ভাষা নেই। তারপর চল্‌ল সে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে।

সবাই দেখলে একটী কায়া আস্তে আস্তে সেই পুরাতন সিঁড়ি বেয়ে নেবে গেল। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল। কানে আস্‌তে লাগল শুধু ঝড়ো পাতার খস্‌ খস্‌ শব্দ, বাতাসের দীর্ঘ একটানা সুর, আর নিশাচর পাখীর ডাক।

ঘরের লোক সে-শব্দ কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌ল। আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল সেই শব্দ। ঘর থেকে বেরিয়ে অনাথ গুপ্তপথ ধর্‌ল—অন্ধকার-সর্পপূর্ণ পথ।

সব চুপ, তারপর আরম্ভ হলো গুঞ্জন,—তর্ক-বিতর্ক, উচ্ছ্বাস, দ্বেষ, রাগ। নিস্তব্ধরাতের শান্ত প্রকৃতি বার বার কেঁপে উঠ্‌তে লাগল।

জীর্ণকক্ষের প্রাচীর গুলো নড়্‌তে লাগল। থেমে গেল নিশাচর পাখীর ডাক—বন্ধ হলো ঝিল্লীর একঘেয়ে রব, বার বার নিবে যেতে লাগ্‌ল আকাশের তারা। এতোকালের বঞ্চিত অভিমান আগ্নেয়গিরির অগ্নি প্রবাহের মতো বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এলো অন্তরের উত্তাপ।

একদিকে নিস্তব্ধ রাতের ঘোর অন্ধকার, আর এক দিকে তরুণ প্রাণের উদ্যম। রাত বেড়ে চল্‌ল, তর্ক চল্‌ল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাদের সংকল্প—নেতা নির্ব্বাচন সে রাত্রেই শেষ করতে হবে। যেমন ক'রেই হোক, সে রাত্রেই শেষ কর্‌তে হবে। তাদের ভাবটা এই, এমন রাত যেন আর আস্‌বে না। সে রাত যেন পালিয়ে যেতে চায়—তাদের সিদ্ধান্ত শেষ না ক'রতে দিয়েই। রাতের অবসানে সবাইকে হ'তে হ'বে বিচ্ছিন্ন, তাড়াহুড়া লেগে যাবে গা ঢাকা দেবার জন্যে!

অন্যদিকে অনাথ চলেছে, স্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে। কোথায় সে চলেছে তা' সে নিজেও জানে না। অভিভূতের মতো সে চলেছে। তার এ চলার বিরাম নেই, পথের শেষ নেই। তাকে যেন চিরকাল এম্‌নি অন্ধকার ভয়াবহ পথে হেঁটে যেতে হবে। এ চলার জন্যই যেন সে এসেছে।

চোখের সাম্‌নে, অন্তরের অন্তরালে, ভবিষ্যতে—সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত অন্ধকার। সে কোন পথ বেছে নেবে—কে তাকে তার গন্তব্য স্থির করে দেবে? এতোকাল সে, সমিতির আওতায় বেড়ে উঠেছিল। তার জীবনের স্বপ্ন, জীবনের আদর্শ, জীবনের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছিল সমিতিকে কেন্দ্র করে। আজ সে সমিতির ভাঙ্গন লেগেছে—বুকের রক্তদিয়ে তিল তিল করে গড়া যে প্রতিষ্ঠান—

যাকে আঁকড়িয়ে সে বেঁচে ছিল—যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে বিসর্জ্জন দিয়েছিল জীবনের সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য—আলিঙ্গন করেছিল বিপদ—ভুলে গিয়েছিল মৃত্যু ভয়।

অনাথ ভাব্‌ছে কোন পথে যাবে—দল ছেড়ে কোন আদর্শ আঁকড়িয়ে ধ'রে জীবন সার্থক কর্‌বে ?

ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতেই সে কখন একটা পুকুর পাড়ে এসে পড়েছে তা সে এতক্ষণ টের পায়নি। হঠাৎ একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া তাকে সচেতন ক'রে তুলল। দেহ-মন অবসন্ন—এক পা নড়বার শক্তি তা'র লোপ পেয়ে গেল। আর পার্‌লে না—অনাথ পুকুর পাড়ে ব'সে পড়ল।

কতক্ষণ সে এ-স্থানে ব'সে ছিল বলা যায় না। সে শুধু ভেবেছে—সন্ধান পায় নি। নিঝুম রাতের সুযোগ নিয়ে কত জীব, তাদের রাতেরমাতন নিয়ে, তার আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে, তা সে টেরই পায়নি। টের পেল—দূরে বিউগলের শব্দ শুনে। সে মন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়াল, বুঝ্‌তে পার্‌ল রাত শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই লোক চক্ষুর অন্তরালে গা ঢাকা দেবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। সে আবার ছুটে চল্‌ল কোথায়—কে জানে ? সেদিন সে জান্‌তে পারলো না, সেই রজনীর পরিস্থিতি তাকে জগতের কোন প্রান্তরেখায় নিয়ে যাবে।

---

(২)

কল কোলাহল মুখরিত কলকাতা সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এক অভিনব প্রেরণায়। জাতির নেতা আসবেন এ সহরে। সুপ্তনগরী যেন দুর্ব্বার প্রেরণায় জেগে উঠেছে। এতোদিন পরে, আজকে বুঝি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই আজকে, সবার চোখের কোণে চঞ্চলতা, মনে আশা, মুখে অনর্গল ভাষা, দেহে শক্তি, কর্ম্ম তৎপরতা।

প্রত্যেক বাড়ীর ছাদের ওপর জাতীয় পতাকা জাতির আভিজাত্য প্রকাশ করছে। যাদের ছাদ ব্যবহারের সুবিধে নেই তারা নিজেদের ঘরের দরজার উপর পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

দেশবন্ধু পার্কের বিরাট প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ সৃষ্টি হ'য়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী জনস্রোত নিয়ন্ত্রন করছে। কেন্দ্রস্থান হ'তে লাউড্‌স্পিকারের সাহায্যে ক্ষণে ক্ষণে নেতার আগমণ বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছে। নেতা কোন কোন পথ ঘুরে, কোথায়, কতক্ষণ থেমে, কখন সভায় আস্‌বেন—খুঁটি নাটি সব জানিয়ে দেয়া হ'চ্ছে।

দেশ বিদেশ থেকে এসেছেন দেশভক্তের দল। পোষাকে পরিচ্ছদে, কথা বার্ত্তায় রয়েছে স্বদেশী ছাপ। দেখ্‌লেই বোঝা যায় কলকাতার বাইরে থেকে এরা এসেছেন নেতার আগমন উপলক্ষে।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। অগণিত জনস্রোত ছুটে চলেছে দেশবন্ধু পার্কের দিকে। জনতার দিকে চাইলে মনে হয় যেন সমস্ত কলকাতা ভেঙ্গে

পড়েছে—যেন কলকাতা বাসীর আজকের সন্ধ্যায় আর কিছুই কর্‌বার নেই। রাস্তার ভীড়, সিনেমা রেষ্টুরেণ্টের ভীড়, মাঠের ভীড়, বাড়ীর ভীড় সমস্ত ভীড় একদিকে জড় হয়েছে।

সমস্ত সভাপ্রাঙ্গনে তিলার্দ্ধ স্থান নেই। সমবেত জনতার গুঞ্জন, শূন্য গগনে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে ফিরে আসছে। অধীর জনতা ধৈর্য্য হারিয়ে অপলক দৃষ্টিতে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ জ্বলে উঠ্‌ল আলো—সভাপ্রাঙ্গন রূপ নিয়ে হেসে উঠ্‌ল।

এই লোকসমুদ্রের এক কোণে একটু ফাঁকা জায়গায় চুপ চাপ দাঁড়িয়ে ছিল একটি তরুণ যুবক। হঠাৎ পিঠে চাপ পড়তেই ফিরে তাকিয়ে দেখে বাল্যবন্ধু শিশির। শিশির ব'ল্‌ল, কিরে চিন্‌তে পারিস্?

আজ বহুদিন পরে দুই বন্ধুতে দেখা। অতীতের স্মৃতি সে যুবকটিকে চঞ্চল করে তুল্‌ল। জীবনের প্রারম্ভে এক সঙ্গে তারা কত কি ক'রেছে। দু'জনের আদর্শই এক মন্ত্রে গড়ে উঠেছিল, জীবনে একই স্বপ্ন সার্থক ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিল তারা। তারপর ঘটল মতের অমিল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হ'তে লাগ্‌ল। বন্ধ হ'লো প্রতিদিনের দেখাশুনা। একজন আর একজনকে এড়িয়ে যেতে লাগল নানা কৌশলে। দৈবাৎ পথে ঘাটে দেখা হ'লে অন্য দিকে চেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতো। আস্তে আস্তে কথা-বার্ত্তা বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপর কালচক্রের আবর্ত্তনে আর জীবন সংগ্রামের কৃচ্ছ্রসাধনায় কে কোথায় ছিট্‌কে পড়ল কেউ টেরও পেল না। ব্যস্ত দুনিয়ায় শুধু বেঁচেথাকার সংগ্রামে সবাই ব্যস্ত। নিছক বেঁচে থাকার কৃচ্ছ্র সাধনায় যে দেশে অধিকাংশেরই সমস্ত শক্তি খরচ হ'য়ে যায়, সেখানে বিগত দিনের সুখ দুঃখের স্মৃতির স্থান কোথায়? ভুল্‌তে হয়, ভুলে যেতে হয় কারা জীবনে এসেছিল। কারা এসেছিল জীবনের বসন্ত প্রভাতে; গুঞ্জনে, কল কোলাহলে, জীবন মধুময় ক'রে

তুলেছিল। এই কেনা বেচার দুনিয়ায় রয়েছে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সঙ্ঘাৎ। একজন আর একজনকে হারিয়ে দেবার পাল্লা, একে অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার নানা ফন্দী। দুনিয়ার এ কেনা বেচার হাটে, স্মৃতির স্থান কোথায়, কোথায় অনাবিল বন্ধুত্ব? কিন্তু তা'হলেও জীবনের প্রথম প্রভাতে যাদের সঙ্গে হয় পরিচয়, জানাজানি, প্রাণের বিনিময়, তাদের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ হয় সেটা হ'য়ে দাঁড়ায়—পদার্থ বিজ্ঞানের সম্বন্ধের মতো। তাকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পারে না বর্হিজগতের কোন উপদ্রব। জগতের য'তো অবাঞ্ছিত উপদ্রব রয়েছে, তাদের কোনটাই—ফল্গু ধারার মতো প্রবাহমান সে-প্রেমধারাকে শুকিয়ে ফেল্‌তে পারে না। দুটি বিভিন্ন হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি-মায়া একত্রিত হ'য়ে একটি অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ ক'রে। যেখানে সে নিজেই একান্ত।

এতোকালের সুপ্ত বন্ধুপ্রীতি, বন্ধন-মুক্ত বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনেরমতো মুহূর্ত্তে ছুটে এল। কোথায় গেল মান অভিমান, কোথায় গেল মতের অমিল, কোথায় গেল দলাদলি। মুহূর্ত্তে তারা সব কাল সমুদ্র পেরিয়ে সেই ভুলে যাওয়া বন্ধুত্বের-বেলাভূমিতে এসে দাঁড়াল। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে নূতন করে একজন আর একজন কে চিনে নিতে চাইল। নিমেষে মিলিয়ে গেল সভাপ্রাঙ্গন, জনতা, আর জনতার কোলাহল। বন্ধুত্বের সে-বেলাভূমিতে জনতা আর জনতার কোলাহলের স্থান নেই। সে জগতে রয়েছে তারা দুটি প্রাণী—একে অন্যের মুখ চেয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে।

হঠাৎ একে অন্যের অজ্ঞাতে গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হোল। শিশির বল্‌ল, চল্, বাইরে চল্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। এসব গোলমালে মানুষ থাকে! চল্! চল্ বাইরে চল।

শিশির অনাথকে টেনে নিয়ে চল্‌ল। অনাথ কি যেন ভাব্‌ল তারপর আর আপত্তি না-করে শিশিরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌ল।

পথে চল্‌তে চল্‌তে দু' বন্ধুতে বিশেষ কোন কথা হ'লো না। দু'জনার মনই সে ভুলে যাওয়া বন্ধুত্বের বেলাভূমিতে ফিরে গেছে। কত কালের কত কথা—ছোট বড়ো হাসি-কান্না মান-অভিমান সার ক'রে দাঁড়াল।

দু'জনে একটা ট্রামে উঠে বস্‌ল। ট্রাম ছুটে চল্‌ল বেলগাছিয়ার দিকে। বেলগাছিয়ার পুল ছেড়ে ওরা ট্রাম থেকে নেবে হাট্‌তে লাগ্‌ল। বিশেষ কোন কথা নেই, দুই বন্ধু পাশাপাশি হেটে চল্‌ল। একজন আর একজনের সান্নিধ্যের সুখে বিভোর, নীরব; কথা ব'লে সে অনাবিল সুখানুভূতিক নষ্ট ক'রে দিতে চায়না। ভাব যেখানে গভীর ভাষা সেখানে মূক।

তারা হেটে চল্‌ল মাইলের পর মাইল। সন্ধ্যার পর রাত হোল। রাত বেড়ে চল্‌ল; তারাও হেটে চল্‌ল। তারা যেন অনন্ত পথের যাত্রী, দিনের পর দিন এমনি করে পাশাপাশি চল্‌তে হ'বে। হঠাৎ শিশির বল্‌ল, বলতো কি ভাব্‌ছো অনাথ?

অনাথের গলা কেঁপে উঠ্‌ল, সে বল্‌ল, এই রকম আর একটা রাতের কথাই ভাব্‌ছিলাম। সেদিন ভেবেছিলাম, তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড়ো অংশ তার সঙ্গে আমি আপোষ কর্‌বো কি ক'রে? সব জিনিষের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্ব্বলতা একবার জন্মগ্রহণ ক'রলে, তাদের আর গতির বিরাম থাকে না।

শিশির মুখ ভারী করে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা চাপাদিতে চেষ্টা ক'র্‌ল। একটু চুপ থেকে ব'ল্‌ল, চল্‌, একদিন আমাদের আড্ডায়। নৃপেন ও সন্তোষ কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছে, তারা এলে তোকে একদিন নিয়ে যাবো। আমি ঠিক বলে দিতে পারি, তুই তাদের দেখে খুসী হবি!

কথা বল্‌তে বল্‌তে রেললাইনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে তারা গ্রামের দিকে এসে পড়ল। পথের দু'ধারে পড়োমাঠ,

খানা-ডোবা ঝোপঝাপ আর চারদিকে জমেছে অন্ধকার। রাত বে'ড়ে চল্‌ল, চারদিকের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দু'একটা নিশাচর পাখী ডেকে ওঠে। মাঝে মাঝে গ্রাম্য কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ঝোপ-ঝাপের আড়ালে জোনাকি পোকার মেলা ব'সেছে। কাঁচা রাস্তার স্থানে স্থানে কাদা জমে আছে। পথের দু' ধারের গাছ-পালা ঝুঁকে রাস্তার অন্ধকার আর পথশ্রম বাড়িয়ে তুলছে। কিন্তু তারা হেটেই চলেছে; কৃত দূরে কে জানে?

কিছুক্ষণ পর তারা একটা অপ্রশস্ত মাঠে বসে পড়ল। পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ, ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ল। অনাথ ধীরে ধীরে বল্‌ল, বুঝ্‌লে শিশির—অনেক দিনের সংস্কারের ওপর আঘাত, মানুষ হঠাৎ সইতে পারে না; কিন্তু মানুষের চাইতে তার বিশেষত্বটাই বড়ো নয়।

শিশির কুণ্ঠিত হলো। পরে বল্‌ল, আমার সবচেয়ে রাগ হয়, যখন আমরা শুধু আমাদের 'object'কে অন্তরালে রেখে 'Ideal' এর পেছনে ছুটি।—কিছুক্ষণ চুপ করে আবার বল্‌ল, সেজন্যই আমরা ভিন্ন পথ ধরেছি।

অনাথ বল্‌ল, পথের আদি নেই, অন্ত নেই। মানুষের প্রয়োজনে মানুষ নিত্য নূতন পথ ধরবে, তাতে আশ্চর্য্য কি। সেটাই যে হবে মানুষের প্রকৃত পরিচয়।

শিশির সাহস পেয়ে বল্‌ল, শোন তবে—দেবেন, নৃপেন, সন্তোষ, আমরা সবাই কংগ্রেস নিয়ে কাজ করছি। রাজেনদা বলেছেন এ পথই শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত। আমাদের চলবার এই একমাত্র উন্মুক্ত "পথ"।

অনাথ বল্‌ল, একান্তভাবে বিচার ক'রলে কোন প্রশ্নেরই শেষ হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েও বিচার চলে না। মোহাবিষ্ট হ'য়ে চলাটা অস্বাস্থ্যকর। আদর্শই মানুষের প্রাণ। অনুপানের সঙ্কুলান কোনদিনই হয় না।

অনাথের কথাগুলো শিশিরের প্রাণে প্রবেশ কর্‌ল কিনা বোঝা গেল না। শিশির ব'লল, পথ আমাদের বদ্‌লাতেই হবে। তুমি ভারতের ফিলজফির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নও, তাই দেশ তোমাকে মুগ্ধ করে না। কিন্তু একবার ভেবে দেখ দেখি, মানবতার এতোবড়ো দান আর কোন দেশে আছে?

অনাথ প্রথম শিশিরের কথার জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বল্‌ল, তোমাদের কর্ম্মপদ্ধতির পরিকল্পনায় আমার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু দেশেরঅবস্থা ভাল হ'বে কিসের জোরে? তা'র মূলধন কোথায়?

—নাই বা আছে আমাদের মূলধন। কিন্তু যেপথ আমরা নিয়েছি—দেশকে স্বাধীন করতে হ'লে, আর কোন পথ নেই। এ খান হ'তে আমরা মূলধন সৃষ্টি কর্‌ব!

শিশিরের শেষের কথাগুলো এমন জোরের সঙ্গে বে'র হ'ল যে, অনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন জবাব দিতে পারলে না। শিশির একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, অনাথ বাঁধা দিয়ে বল্‌ল, গিরি পর্ব্বত হ'তে জলস্রোত দেখেছো? কোন স্রোত নানা বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সাগরে গিয়ে পড়ে, কোনটা নদীর সঙ্গে মিশে, আবার কোনটা যাত্রা পথেই শুকিয়ে যায়, গন্তব্য পথ অতিক্রম করে যাত্রা সার্থক করতে পারে না।

শিশির একটু পরে জবাব দিল, জলস্রোত যদি সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে না মিল্‌তে পারে, তবে কি এই বল্‌তে হ'বে যে, তার যাত্রাটা ভুল?

অনাথ বল্‌ল, ভুল ত আমি বলছিনে। সমুদ্রের সঙ্গে মিলবার যে-দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা, যে-প্রেরণা, যে কৃচ্ছ্রসাধনা, যে-সংগ্রাম,

তার কি কোন মূল্য নেই ? নিশ্চয়ই আছে, কোন প্রচেষ্টাই মূল্যহীন হ'তে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে সময় নষ্ট হয়েছে, শক্তির অপচয় হয়েছে। কিন্তু, আজ যে-প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম বলে মনে হয়, কাল সেটা সার্থক হ'তে পারে। প্রত্যেক প্রচেষ্টারই সার্থকতা আছে।

এই ব'লে অনাথ আকাশেরদিকে ফিরে তাকাল। আকাশে তখন অসংখ্য নক্ষত্র, সাদা মেঘের সঙ্গে খেলা ক'রছে। সেই দিকে তাকিয়ে আপন মনেই ব'লল, মানুষের জীবনের অধিকাংশ চেষ্টাইতো ব্যর্থ হয়। কয়জন লোক নিজের লক্ষ্যের কাছাকাছি যেতে পারে? যেমন ছোট ছোট জলস্রোত। তাই বলে কি সত্যি সত্যি সে-সব প্রচেষ্টা মূল্যহীন? জগতে কোন কাজেই তারা আসে না? যে-নদী মরুপথে পথ হারাল তার কি সত্যি সত্যিই সমস্ত ফুরিয়ে গেল—তার সংগ্রামের কোন মূল্যই রইল না?"

শিশির অনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রছিল, তাই উপহাসচ্ছলে ব'লল, তুই কি কবি হ'লি নাকি?

অনাথ লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্‌ল, প্রয়োজন আছে বলেই তাদের সৃষ্টি, তাদের উৎস মঙ্গলজনক, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার বিপর্য্যয়ে তারা মূল্যহীন। আজকে যার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, কালকে হয়তো তার কোন প্রয়োজন থাকবে না। অথচ পরবর্ত্তী সার্থকতার মূলে থাকে অতীতের লভ্যাংশ।

দূরে একটী শব্দ হওয়াতে দু'জনে ফিরে চাইল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ কিছুই আবিষ্কার ক'রতে পা'র্‌ল না। তারপর অনাথ বল্‌লে, মানুষের চরিত্র তার নিজস্ব চিন্তাধারা। মানুষের চিন্তাধারা তার বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বিচার বুদ্ধির ভুলও

তো হ'তে পারে। তার মধ্যে মনুষ্যজনোচিত অন্য সমস্ত উপসর্গ এরূপ প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তখন মানুষ, সত্য ও মিথ্যার তারতম্য করতে পারে না। কিন্তু সেখানেই তার শেষ নয়।

অনাথের কথায় শিশিরের মন সায় দিল না, সে কোন যুক্তিই মেনে নিল না। শিশির বল্‌ল, নৃপেন, সন্তোষ, দেবেন, মিহিরদা আমরা সবাই এখন হ'তে কংগ্রেস নিয়ে কাজ চালাবো। এই প্রতিষ্ঠানের ওপর আমাদের সবাইর বিশ্বাস আছে। সবাই বিশ্বাস করে যে, কংগ্রেসই দেশের স্বাধীনতা এনে দেবে। আমরাও তোমাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলি।

অনাথ কোন জবাব দিতে পারল না। চুপ চাপ মাথাগুঁজে বসে রইল। কয়েক মিনিট কেটে গেল। পরে শিশির অনাথকে একটা নাড়া দিয়ে বল্‌ল, কি, চুপ করে কেন, ঘুমাচ্ছো নাকি ?

শিশিরের স্পর্শে অনাথের হুঁশ হলো। সে যেন চেতনা ফিরে পেল। শুধু বল্‌ল, এতদিনে তাহ'লে গুপ্ত সমিতির নেশা কেটে গেছে ?

অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্যপথের স্তব্ধতা ফিরে এলো। দুজনই নির্ব্বাক নিশ্চল। গভীর রাতে সৃষ্টি যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। নিশাচর পাখীর ডাক, খানা ডোবায় সরিসৃপের ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ, আর চারিদিকে ঘন, অবিমিশ্র অন্ধকার মিলে প্রতি মুহূর্ত্তে এক অনাগত আশঙ্কা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

হঠাৎ জলের মধ্যে কিসের একটা শব্দে দুজনার চেতনা ফিরে এলো। শিশির বল্‌ল, কই আমার কথার জবাব দিলে না ?

তুমিও তো আমার কথার কোন জবাব দিলে না ?

এমন সময় তারা লক্ষ্য করল কারা যেন তাদের দিকে আস্‌ছে।

দুজন লোক। দুই বন্ধুই ঘাবড়িয়ে গেল। ভাব্‌ল নিশ্চয়ই তারা গুপ্তচর। শিশির আর অনাথ চাদর জড়িয়ে ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। তাদের চোখ কেবল অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করে—তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। লোক দুটি কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। একটু পরে একজন বল্‌ল, শিশির না?

শিশির যেন হাতে চাঁদ পেল। বল্‌ল, যোগেশ যে; আশ্চর্য্য! সঙ্গে কে?—সুরেশ বুঝি?

সুরেশ গম্ভীরভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ আমি—

যোগেশ বল্‌ল, ভালই হয়েছে, অনাথকে যে এখানে পাওয়া গেল। অনাথের সঙ্গে আজকে আমাদের বোঝাপড়া হবে।

অনাথ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল, কিসের বোঝাপড়া?

সুরেশ জবাব দিল, বিশেষ কিছু না, শুধু দেনা পাওনার হিসেব।

আমি তোমাদের কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, একটু খুলে বল্‌লে ভাল হতো না?

বেশতো, খুলেই বল্‌ছি। তুমি আমাদের গতিবিধির খবর অনেকের কাছে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছ। তার প্রমাণ শিশিরও কিছু কিছু দিতে পার্‌বে।

অনাথ ততোধিক আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌ল, শিশিরের সঙ্গে আমার দেখা, সে-রাতের পর আজ এই প্রথম!

যোগেশ ব'ল্‌ল, সে যাইহোক—আমরা জান্‌তে চাই, তুমি কেন আমাদের দলের ছেলেদের সম্বন্ধে নিন্দা কর? কেন তাদের ভাগিয়ে নিয়ে দাদার দলে ভর্ত্তি কর্‌তে চেষ্টা ক'রছ?

তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমার আচরণে আজ পর্য্যন্ত এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যাতে তোমাদের

ওরকম সন্দেহ হতে পারে। দাদার সঙ্গে আমার যে-সম্বন্ধ, তোমাদের সঙ্গেও ঠিক তেম্নি। আজ পর্য্যন্ত তার কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। তা ছাড়া এটা বুঝ্তে পারো যে, তোমাদের সঙ্গে আমার দেখাশুনা নেই অনেক দিন থেকে। সে ভীষণরাতের কথা মনে আছে? সে-রাতের পর আর এক দিনের জন্যও তো দেখা হয়নি। জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত—কারো খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের কথা অন্যকে বল্বার সময় ও উৎসাহ কোথায়?

সুরেশ ব'ল্ল,—হয়েছে! হয়েছে!—আর বল্তে হ'বেনা। দলের ক্ষতি কর্ছো তুমি। এর কি শাস্তি তা' জানো?

অনাথ কি যেন বল্তে যাচ্ছিল; যোগেশ তার কোমর থেকে পিস্তল বের করে অনাথকে দেখিয়ে বল্ল এটা আশা করি চেনো—?

অনাথ ব'ল্ল হ্যা, চিনি! কিন্তু আমারও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে—এই বলে, অনাথ ক্ষিপ্রহস্তে, নিজের কটিদেশ হ'তে তার পিস্তলটা বের ক'রে ব'লল, নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে কোন সুফল হবে না, যোগেশ। তাতে নিজেদের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাবে। তাতে জাতির অমঙ্গল। শক্তিপরীক্ষার জন্য বর্হিশক্তির বিরুদ্ধে লাগালে সত্যিকারের শক্তি-পরীক্ষা হ'বে।

সুরেশ উচ্চস্বরে ব'ল্ল, দেশে দ্বিতীয়-পন্থীর স্থান নেই।

এমন সময় একখানা 'পেসেঞ্জার ট্রেন' সিয়ালদা' চলেছিল। হঠাৎ ট্রেন খানা তাঁদের কাছে এসে থেমে গেল। মনে হ'ল কি যেন একটা বিপদ হয়েছে; কাজেই ড্রাইভার ব্রেক্ কসেদিয়ে ট্রেন থামিয়েছে। সার্চলাইটের প্রখর আলো দেখে যোগেশ, সুরেশ ও শিশির চম্কে উঠল। যোগেশ পিস্তলটি লুকিয়ে ফেল্ল। সুরেশও শিশিরকে সঙ্গে করে অন্ধকারে মিশে গেল।

অনাথ যেন এতক্ষণ মোহঘোরে অবসন্ন ছিল। যখন চেতনা ফিরে এল, তখন সে চেয়ে দেখে কেউ নেই—শিশির নেই, সুরেশ নেই, যোগেশ নেই রয়েছে সে একা। স্তব্ধরাতের বুকে দাঁড়িয়ে সেই ট্রেণটা!—মাত্র সেটা সচল পদার্থ। আকাশে বাষ্প ছুড়ে দিতে দিতে ট্রেণ ছুটে চল্‌ল। ইন্‌জিনটার দিকে চেয়ে চেয়ে অনাথ ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এইতো জগতের নিয়ম। এমনি করেই সব চলে।—বাষ্প—বাষ্পই মানুষের প্রাণ। বাষ্পই মানুষের অনর্থ সৃষ্টি করে! অথচ এরি জন্যে কত হাঙ্গামা, কত পরিশ্রম কত অপচয়। অদ্ভুত! অদ্ভুত এ দুনিয়ার নিয়ম।

কিছুক্ষণ আগে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া চল্‌ছিল--এখন সব ঠাণ্ডা নিশ্চল। এম্‌নি তার জীবন—সে একা। দলছাড়া, বন্ধু ছাড়া, কক্ষ্যচ্যুত গ্রহের মতো সে এ কোন জগতে এসে পড়ল? কিন্তু তাকে বাঁচ্‌তে হ'বে, তাকে চল্‌তে হ'বে—জীবনের আদর্শ সার্থক কর্‌তে হ'বে। এম্‌নি কতো এলোমেলো চিন্তা আস্‌তে লাগ্‌ল—সামঞ্জস্যহীন—অর্থহীন!

পলিটিক্স ব্যাপারে যুবকদের কারারুদ্ধ করা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় নয়। কাজেই প্রথমে যে ত্রাসের সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা ক্রমেই অবজ্ঞা ও উপহাসের ব্যাপার হ'য়ে দাড়াল। দিন কয়েক দুঃখ দেওয়া ভিন্ন, এর আর কোন গভীর উদ্দেশ্য যেন নেই। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার হ'য়ে যে এর পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে, তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কাজেই এবার অলৌকিক শক্তির কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হ'ল, তার পরই আবার তারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে এল। আত্মীয়—অনাত্মীয় বিশেষ প্রভেদ রইল না। সহর ও পল্লী সর্ব্বত্রই এক দশা। স্কুল—কলেজে, হাটে—বাজারে, সর্ব্বত্র সরকারের যেমন প্রখর দৃষ্টি, তেমনি প্রতি-গৃহের অন্দরমহলে গৃহস্বামীদের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। কিন্তু তাতেও গতির কোন হ্রাস হ'ল না। সহপাঠী হ'লেই, তার উপর দোষ আরোপ হ'তে লাগল। অভিভাবকদের মধ্যে বহুদিন ধরে, যেখানে বাক্যালাপ বন্ধছিল, সহসা পথে দেখা হ'তেই, উভয়ের চোখেই জল দেখা যেতো। কারোও ভাই, কারোও ছেলে, কারোও মেয়ে, ভাগ্নে ইত্যাদি,— দেউলী, না হয় হিজলী বন্দীশালায় অবরুদ্ধ। রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকার মত মনের জোর আর নেই। কখনও অতি অস্পষ্ট ভাষায় কথা হ'য়েছে, কখনও তাও হয়নি—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যান কামনা ক'রে বিদায় নিয়েছেন।

এখানে কবির কথাই মনেপড়ে—একদিনের আনন্দ যেন আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জা বোধ না করে। আজিকার দুঃখের দাহ যেন বিগত দিনের সুখের শিশিরবিন্দু গুলোকে শুষে না ফেলে। কারণ জীবনের সুখ দুঃখ কোনটাই নাকি সত্য নয়। সত্য শুধু তার চঞ্চল মুহূর্ত্ত গুলো, সত্য শুধু তার চলে যাবার ছন্দটুকু, বুদ্ধি ও হৃদয়দিয়ে এ-সত্যকে পাওয়াই নাকি সত্যিকারের পাওয়া।

এম্‌নি রাষ্ট্র দুর্যোগের দিনে কলকাতায় বর্ষারধারা নেবে এলো! সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই রাস্তা জনবিরল হ'য়ে চলাচল একপ্রকার বন্ধ হল। অবিশ্রান্ত ধারায় বারিপাত আর বজ্রপাত চল্‌ল। বৃষ্টিরজলে অনেক রাস্তা ডুবেগেল। ট্রাম বাস মোটর এমন কি রিক্সাও চলে না। আকাশের অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ যেন কলকাতা সহরটাকে অসময়ে ঘুমপাড়িয়ে রেখেছে। এ সন্ধ্যার ক'লকাতা নয়, এযেন রাত দুপুরের কলকাতা। কেবল একটানা বৃষ্টিপড়ার শব্দ ; দমকা হাওয়া ছাড়া আর কোনপ্রকার সচলতার প্রকাশ নেই—কি রাস্তায় ; কি রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলোতে। মনে হয় জলপ্লাবিত সহরে বাড়ীগুলো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ঝিমুচ্ছে। বাড়ীগুলো ঝিমুচ্ছে আর রাস্তাগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল রাস্তার আলোগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে—ঘুমন্ত নগরী পাহাড়া দিচ্ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে যে-আলোর ফিন্‌কি মাঝে মাঝে ছিট্‌কে পড়ে, তাতে প্রমান হয় যে, এ ঘুমন্তনগরীর সব লোকজন এখনও পালিয়ে যায়নি।

এমনি দুর্য্যোগের রাতে দু-জন যুবক রাস্তা দিয়ে ত্রস্ত হেটে চ'লেছে। তাদের জামা কাপড় একেবারে ভিজে গেছে। পুকুর থেকে ডুবদিয়ে উঠ্‌লে যাহ'তো। কিন্তু সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। তারা ছুটে চ'লেছে। দেখ্‌লেই মনে হয় অনেক দূর থেকে তারা আস্‌ছে। এখন তারা মধ্য-কল্‌কাতা দিয়ে চলেছে।

তারা একটা দোতালা বাড়ীর দরজায় 'ঘা' দিতে লাগ্‌ল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একটি মহিলা মূর্ত্তি। থান কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা।—ছোট-খাটো, ফর্সারং, মাঝারি বয়সের সুশ্রী মহিলা।

ইস্, একেবারে ভিজে গেছো—

এসো; ভেতরে এসো—সিঁধে ওপরে চ'লে যাও, জামা কাপড় শিগ্‌গির্ ছেড়ে ফেল। গা-মাথা ভাল ক'রে মুছে নিও কিন্তু—যাও শিগগির যাও—ব'লে মহিলাটী তাদের দু'জনকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ওপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে একজন গান ধর্‌ল—"কেন জীবনের এতো কোলাহল—"

সঙ্গের বন্ধু গানে বাধা দিয়ে বল্‌ল, আঃ এ'রাত দুপুরে অমন ষাড়ের মতো চেঁচাস্‌নে—পাশের বাড়ীর লোকজন সব ঘুমিয়েছে।

হাবু বল্‌ল, বুঝ্‌লে দিদি, নিতাইটা আমার গান শুন্‌লেই চটে যায়।

দিদি ব'ল্‌লেন না চটে নিতাইর উপায় কি? সে যে নিজে একটুও গাইতে পারে না।—তাইনা নিতাই?

নিতাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে এ-রসিকতা কাণে না তুলে বল্‌ল, আসল কথা হোচ্ছে বহুদিন হল আমরা civic rights and obligation ভুলে গেছি। কিন্তু এটা ভুল্‌লে চল্‌বে না। যেমন ক'রেই হোক্ এটা আগ্‌লে রাখ্‌তে হ'বে। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের প্রবৃত্তি গুলো নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে—এ পথেরদাবীতেও যদি আমরা কৃতকার্য্য নাহ'তে পারি, তবে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা ওপরে এলো। মহিলাটী বাক্স থেকে হাবু আর নিতাইর জন্য জামা কাপড় বের ক'রে দিলেন। মনে হ'ল ওরকম জামা কাপড় তাঁর কাছে মজুত থাকে। হয়তো প্রায়ই প্রয়োজন হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যাদের জন্য প্রয়োজন তারা একদিনের জন্যও দিদিকে জিজ্ঞেস করেনি যে, কি করে তারকাছে পুরুষের জামা কাপড় থাকে। স্নেহের দান অকাতরে গ্রহণ করেছে, কিকরে কোথা থেকে সে-দান এলো তার খবর নেবার ফুরসৎ হয়নি।

জামা কাপড় ছেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে হাবু ব'ল্‌ল; দিদি, আজ্‌কে এখন পর্য্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি। দেখি কি আছে অন্নপূর্ণার ঘরে? যা আছে নিয়ে এসো।

কথা শুনে দিদির চোখ ছল ছল করে উঠ্‌ল।

বল্‌লেন, ভাই ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই, এখন চারটে মুড়ি খাও, আমি ভাত চাপাচ্ছি। আজ্‌কে আমার একাদশী ছিল কিনা, তাই কিছু রান্নাবান্না করিনি।

দিদি নীচে যাবার উপক্রম কর্‌ছিলেন। নিতাই ও হাবু তাঁর আঁচল টেনে ধর্‌ল। তারপর হাবু বল্‌ল, রক্ষেকরো দিদি, এ-রাত দুপুরে তোমায় আর রান্না করতে হ'বে না। মুড়ি আছে; মুড়িই দাও। পেয়াজ আর বাতাসা দিতে ভুলো না যেন—

দিদি ব'ল্‌লেন, ভাত রাঁধ্‌তে আধ ঘণ্টা লাগ্‌বে না; একটু সবুর কর —সব ঠিক হ'য়ে যাবে—

হাবু ব'ল্‌ল, ভাত রাঁধতে যদি যাও, আমরা তোমার রান্নাঘরে শুয়েপড়ে সত্যাগ্রহ কর্‌বো,—বুঝ্‌লে?

দিদি জান্‌তেন্ এদের সঙ্গে একবার তর্ক আরম্ভ হলে কোথায় গিয়ে থাম্‌বে। কাজেই তিনি ব'ল্‌লেন, আচ্ছা ব'সো, মুড়িই নিয়ে আস্‌ছি।

দিদি নীচে নেমে যাচ্ছিলেন। হাবু ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—তোমায় আম্‌রা প্রায়ই বিরক্ত করি। আমাদের সঙ্গে তুমিও না জানি কোনদিন বিপদে পড়। এখন হ'তে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

দিদি থম্‌কে দাঁড়ালেন। পরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ব'ল্‌লেন,—আজ্‌কে যদি আমার একটি মাত্র ছেলেও থাক্‌তো, তবে তাকেও তোমাদের সঙ্গে পাঠাতাম। আজ শুধু এইটুকুন জেনে রাখো যে, সকল অবস্থাতেই আমার ঘরেরদরজা তোমাদের জন্য খোলা থাকবে।

এই ব'লে দিদি নীচে নেবে গেলেন। নিতাই ও হাবু স্তম্ভিত হ'য়ে সে খানেই দঁড়িয়ে রইল। অনুতাপে তাদের সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেছে।

একটু পরে দিদি খাবারের থালা নিয়ে উপরে উঠ্‌লেন, হাবু ও নিতাইকে সেভাবে দাঁড়াতে দেখে প্রথমটা একটু বিস্মিত হ'লেন। তারপর পূর্ব্বকথা স্মরণ হ'তেই বল্‌লেন, এজন্য এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে, আমাকেই ব্যথা দেবে। এস ভাই ভেতরে এস। আমি কিছু মনে করিনি—এ বলে খাবারের থালাটা মেঝেতে রেখে, ফিরে এলেন এবং দু'জন কে দুহাতে ধরে, ভেতরে নিয়ে গেলেন।

নিতাই ও হাবুর চোখ ততক্ষণে ছল ছল করে উঠল। নিতাই ব'ল্‌ল, দিদি আমায় ক্ষমা কর। আমি না জেনে তোমায় ব্যথা দিয়েছি।

হাবু কিছু নাবলে, ঢিপ করে মাটিতে ব'সে, দিদির পা জড়িয়ে ধর্‌ল।

এ ব্যাপারের জন্য দিদি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁর কণ্ঠরোধ হ'য়ে এল। কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌লেন না। হাবুকে টেনে

উঠালেন এবং দু'জনের মাথায় হাতবুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।' একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ব'ল্‌লেন, এবার তোমরা খেতে বোস। আমি জল নিয়ে আস্‌ছি।

মেঘ কেটে গেল। দিগন্ত প্রসারিত নভমণ্ডলে অসংখ্য তারা ফুটে উঠ্‌ল। যেন হর্ম্মশিরে অসংখ্য প্রদীপ দিয়ে কে সাজিয়েছে। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়্‌ল। সমস্ত ঘরটা যেন হেসে উঠ্‌ল। একটা পাখী শীশ দিতে দিতে উড়ে চলে গেল।

দিদির কাছ হ'তে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে হাবু ব'ল্‌ল, দিদি এবার তুমি শোও গে, আমরা এখানে ঐ বিছানা পেতে শুয়ে প'ড়বো। তুমি যাও।

দিদি আর বাক্যব্যয় না করে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন।

দু'বন্ধুতে গল্প চল্‌ছিল। হাসি ঠাট্টা কর্‌তে কর্‌তে খাচ্ছিল। এমন সময় সদর দরজায় শব্দ হ'তে লাগ্‌ল।

হাবু চিৎকার ক'রে বল্‌ল, মশাই, নম্বর ভুল করেছেন—এগিয়ে যান,—দোহাই আপনার, আমাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত করবেন না।

ফের দরজায় 'ঘা' পড়্‌তে লাগ্‌ল, আর হাবুও চিৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল,—নম্বর ভুল ক'রেছেন মশাই, নম্বর ভুল করেছেন, এগিয়ে যান। কিন্তু, চিৎকার ক'র্‌লে কি হ'বে—দরজায় 'ঘা' তেম্‌নি চল্‌ল। এবার হাবু চটে গেল; বল্‌ছি মশাই এতো ক'রে;—এ বাড়ী নয়, এগিয়ে যান—তা শুন্‌ছেনইনা। দরজা ভেঙ্গে গেলে খুসী হবেন নাকি?

নিতাই ব'ল্‌ল, লোকটা হয়তো পথ ভুল করেছে—একটু সাহায্য করা যাক্‌—

হাবু বল্‌ল, তার ভুলের সংশোধন তাকেই করতে হ'বে। আমাদের কি মাথা ব্যথা? পথ-হাঁটার দুঃখ এড়াতে চেষ্টা করলে,

নিজেকেই ফাঁকি দেয়া হয়—

এমন সময় খুব জোড়ে 'ঘা' পড়্তে লাগ্ল। তখন দু-বন্ধুই নীচে নেমে গেল। আস্তে আস্ত দরজা খুলে একটু ফাক করে দেখ্তে গেল—কে এসেছে। দেখে অনাথ! অনাথকে ভেতরে আস্তে দিয়ে নিতাই বল্ল "এত রাত্রে কোথা থেকে!?"

ব'লতেই অনাথ নিমিষে দরজা বন্ধ করে, তাদের নিয়ে ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠ্তে উঠ্তে অনাথ বল্ল, শিগ্গির ঘরের আলো নিবিয়েদাও, জানালা সব বন্ধকরে দাও—বলে নিজেই ত্রস্ত সমস্ত জানালা বন্ধ করে দিয়ে হাপাতে লাগ্ল।

হাবু ও নিতাই অবাক হ'য়ে এতক্ষণ অনাথের কাণ্ড দেখ্ছিল। কোন কথা বলতে পারেনি। এখন সুযোগ পেয়ে, হাবু বল্ল, ব্যাপার কি?

অনাথ ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, 'Esplanade' এ দেবেনের সঙ্গে 'Engagement'ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল একটা লোক আমার পেছন নিয়েছে তখন সোজা পথে না-গিয়ে একটা 'Bar'এ ঢুকে পড়্লাম। দুজনায়ই কিছু খেলাম—মদই—কিআর করাযায়। একটু পরে চেয়ে দেখি সে-লোকটি এককোনে বসে বসে খাচ্ছে। ব্যাপার বুঝ্তে আর বাকী রইল না। তখন তাড়াতাড়ি দুটো টিকিট কিনে 'Elphinstoneএ' ঢুকে পড়্লাম। সিনেমা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই 'হল' থেকে বেড়িয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে Corporation-Buildingএর এককোনে অন্ধকারে আশ্রয় নিলেম—Spyটা এখনও পেছনে লেগে আছে কিনা সন্দেহটা ভাঙ্বার জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি সাধারণ পোষাকপরা

কয়েকজন লোক ছুটোছুটি কর্‌ছে—আমাদের সাম্‌নে আট হাতে বেশী দূরে হবেনা—দুটি লোক এসে দাঁড়াল। তারা বলাবলি কর্‌ছিল,—এদিক দিয়ে গেছে। অপর একজন বল্‌ছিল ওদিকে গেছে। কেউ সন্ধান না পেয়ে, চারদিক তাঁকাতে লাগ্‌ল তখন আমাদের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, এই বুঝি ধরা পড়্‌লাম। কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে বড্ড ভুল করেছি। মানুষ সাধারণ, পেছনেরদিকে ফিরে দেখে না। শেষটায় একজন ব'লে উঠল, করিমের জিম্বায় রেখে আমি খবর দিতে গিছ্‌লাম—সে-যে কি রকম watch ক'রেছে—একটু responsiblity নেই—এখন কি' মুস্কিল বলতো? তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে একজনের নির্দ্দেশ মতো দুজন লোক এগিয়ে চল্‌ল।

হাবু বল্‌ল, তারপর—?

তারপর দেবেন কে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গেলাম। সেখান থেকে আস্‌বার সময় রসারোড দিয়ে বেরিয়ে বাসের অপেক্ষায় ছিলাম—একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না করে দুই নম্বর বাসে উঠ্‌লাম। মনেহলো কে জানি পেছন নিল। কিন্তু খেয়াল কর্‌লাম না।

হঠাৎ অনাথ কথা বলা থামিয়ে কান খাড়া করে চুপ করে কি যেন শুন্‌তে চেষ্টা কর্‌ল, পরে বল্‌ল, বুঝলুম আমার পেছন পেছন একজন লোক উঠ্‌ল।

নিতাই অধৈর্য্য হয়ে ব'ল্‌ল তারপর—?

অন্ধকারে চারিদিক তাকিয়ে অনাথ বল্‌ল, একটু স্বস্তির নিস্বাস ফেলে আরাম করে বাসে চেপে বসেছি—হঠাৎ চোখে পড়্‌লো—যে-লোকটা বাসের এককোনে বসে আছে—তাকে

Corporation-Building এর সাম্‌নে ছুটোছুটি করতে দেখেছিলাম। বাস তখন Park Street এর সামনে এসে গেছে, কাজেই আর দেরী নাকরে বেলদিয়ে চলন্ত বাস হ'তে নেবে পড়্‌লাম।

হাবু বলল, থামো কেন! বলে যাওনা—!

অনাথ জানালার কাছে গিয়ে একবার রাস্তাটা ভাল করে দেখে নিলো। ফিরে এসে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, তারপর, সে লোকটাও একটু দূরেই নেবে পড়ল লক্ষ্য করলাম। একটা ট্যেক্সি ছুটে চলেছিল—সেটা থামিয়ে উঠে পড়লাম। লোয়ারসারকুলার রোডে পৌঁছাবার আগেই ট্যেক্সি ছেড়ে দিলাম। সরু রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দশনম্বর বাস ধরলাম। সিয়ালদা নেমে পড়ি। তারপর এখানে। কিন্তু আমার মনে হোচ্ছে ওরা আমাকে এখনও Follow কর্‌ছে। বলে সে বন্ধ জানালাগুলোরদিকে বার বার তাকাতে লাগ্‌ল।

নিতাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, এটা আমাদের স্বভাব তা' নাহ'লে এ সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই—যাক্‌ দেবেন কোথায় আছে?

সে টালীগঞ্জের D. I. B. ব্যেরেকের পেছনের বাড়ীতে

হাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কথা বল্‌বার সুবিধে পেয়ে বল্‌ল, দীঘিরপাড়ার মামলার কি হোল?

সুরেনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিয়েছে। হিতেনকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—সতীস আর অমরকে প্রমান অভাবে ordinanceএ আটক রেখেছে।

নিতাই বল্‌ল, সুরেন নিজের বুদ্ধির দোষে ধরাপরেছে। আমি অনেক বলেছিলাম—আমার কথা শুন্‌লে আর এ অবস্থা হতোনা; বড্ড কষ্ট হয় সুরেনের জন্য।

হাবু ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌ল, সুরেনকে 'escort' কর্‌বার জন্য তিন তিনটি প্রাণী প্রস্তুত ছিল—কিন্তু কেউ তার নিকট যেতে পার্‌ল না। সবই অদৃষ্ট।

অনাথ বল্‌ল, সে দোষ সুরেনের নয় ; তার গোড়ালিতে গুলি লাগাতে সে দৌড়িয়ে 'space cover' কর্‌তে পারল না। কিন্তু এখন আমাদের দলে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়েছে, তার সমাধান করার কি উপায় আছে ?

নিতাই বল্‌ল, অনাহার, অনিদ্রা—কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে চলা—অভাব অনটন আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

হাবু চটে গিয়ে বল্‌ল, Bigger action এর জন্য তৈরী হবার দিন এসে গেছে। 'Action'এর দিন স্থির করে ফেলা যাক্।

নিতাই বল্‌ল, "Action" টাকে একান্তভাবে ভাবলে চল্‌বে না, শূন্যের অঙ্ক দিয়ে তহবিল ফাঁপিয়ে তুলে, অন্তসারহীন থলিটার মোটা চেহারা জাতিকে নিছক ঠকাবে, তাতে দেশের কোন আয় হয় না। পদার্থ যেখানে নেই—ওগুলো সেখানে মায়া।

কথাটা যে-সত্য তা' সবাই জানে। এক ধরনের লোক আছে যারা ভুত মানেনা—কিন্তু ভুতের ভয় করে। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। কাজেই নিতাইর কথা শুনে হাবুর চোখদুটো জ্বলে উঠল। সে ব'ল্‌ল, সে বিচারের দায়ীত্ব নিয়ে আমাদের কাজ কি ? সে বিচার ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। বর্ত্তমানে, আমাদের এ প্রচেষ্টা যদি অসত্য হয়ে যায়, ভবিষ্যৎ—তার খোরাক জোগাবে। আমাদের কি ? আমাদের যেএই পথে চল্‌তেই হবে।

অনাথ একমনে সব শুন্‌ছিল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ব'ল্‌ল, ক্ষোভ, দুঃখ আর নৈরাশ্যের মাঝে যাদের সৃষ্টি, যারা এমন ক্ষনস্থায়ী এমন

ভঙ্গুর—তাদের এর বেশী সম্মান আশা করা দুরাকাঙ্খার নামান্তর। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জান্‌তে পারাই পরমশক্তি। এর মধ্যে যদি দুঃখ আসে, তবে মনকে এই বলে সান্তনা দিতে হবে, যে এমনি দুঃখ বহু মানুষের ভাগ্যে বহুবার এসেছে। এমনি করেই চলে জীবন, চলে সংসার—দিনেরপর দিন, যুগের পর যুগ। অনন্ত কোটী জীবন চলেছে জগতের এ যাত্রাপথে। কোন কিছুর ওপরেই মানুষের জীবন নিশ্চিন্তে নির্ভর কর্‌তে পারে না। দুঃখ জীবনে রয়েছে। সে দুঃখকে মেনেনিয়ে, গৌরবে বহন করবার অধিকার মানুষের। এই তো সত্যিকারের মানব ধর্ম্ম—জীবধর্ম্ম—একে অস্বীকার করা যায় না।

অনাথ আবার বল্‌ল, উইপোকা যদি জান্‌তেও পারতো যে, পাখা নিয়ে আকাশে উড়তে যাওয়া বিপদ জনক—তবুও সে মাটির নীচে পড়ে থাক্‌তো না। সে আকাশে উড়তোই—সকল কীট পতঙ্গের শ্যেন দৃষ্টি উপেক্ষা করে। পাখার ধর্ম্মই—আকাশের দিকে পাখামেলে ঊর্দ্ধের আলো বাতাসের আস্বাদন গ্রহণ করে।

কিছুক্ষণ থেমে অনাথ বল্‌ল, আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রভেদ এখন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—অন্যদিকে আমাদের পথ যখন এতো দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে—জীবনের অধ্যায়ের শেষ—আমাদের যৎকিঞ্চিত দানে যেন থেকে যায়—জগতের আলো বাতাসের মাঝখানে একটী——

অনাথের কথা আট্‌কে গেল। দিদি সে-ঘরে তরিৎবেগে প্রবেশ ক'রে, মৃদুস্বরে ব'ল্‌লেন, পুলিশ বাড়ী ঘেরাও ক'রেছে! তোমরা শিগ্‌গির পালাও!

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাবু ও নিতাই কোমর হ'তে তাদের পিস্তল বের ক'রে উঠে দাঁড়াল। অনাথও উঠে দাঁড়াল কিন্তু হাবু নিতাইকে

নিরস্ত্র করে ব'ল্‌ল, ধৈর্য্য হারাতে হয়না, আমাদের এখনও অনেক কিছু কর্‌বার আছে। এখন পালাতে হবে।

নিতাই ব'ল্‌ল, কিন্তু পালাবো কি ভাবে ?

এ প্রশ্নের জবাব কারো মুখ থেকে বেরুলনা। প্রশ্নটা, দিদিকে ব্যাকুল ক'রল। তিনি এগিয়ে এসে ব'ল্‌লেন, আমি বেঁচে থাক্‌তে পুলিশ তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে এ হতেই পারেনা, তোম্‌রা আমার সঙ্গে এসো, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

দিদি তাদের ছাদের ওপর নিয়ে গেলেন। ছাদের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি ব'ল্‌লেন, এই যে প্রাচীর দেখ্‌ছো, এটার পরই একটা সরুগলি আছে। এ গলির খবর কেউ জানেনা। আমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাক্‌তে 'Corporation'এর সঙ্গে এ জায়গা নিয়ে মাম্‌লা হয়েছিল, তারপর থেকে এ-পথ অচল হয়ে যায়, লোকে ভুলেও গেছে এ গলিটার কথা। এ গলিদিয়ে এগিয়ে পাবে আর একটী প্রাচীর—সেটা পেরিয়ে পাবে একটা গোঁশালা—গোঁশালা ছেড়ে পড়বে গিয়ে বড়ো রাস্তায়—যাও—আর দেরী করোনা ; ঐ শোন পুলিশ দরজায় বার বার ঘা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া পীড়িত বুড়োচাকর মোহন জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দরজা খুলে দিল। সে বেচারা নীচে শুয়েছিল—দরজায় দমাদম্ লাথির সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এতোক্ষণ ঠেলাঠেলির পর ক্রুদ্ধ পুলিশ, যাকে প্রথম সাম্‌নে পেল রাগের ঝাজটা তার ওপরই ঢাল্‌ল। এক ঘুসিতে বুড়োকে ঘায়েল করে মাটিতে ফেলে দিল।

এমন সময় দিদি ছুটে এলেন। সম্মুখে মোহনকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে তিনি গোরা পুলিশকে ব'ল্‌লেন, তোমরা কার হুকুমে আমার বাড়ীতে ঢুকেছো—আর আমার চাকরকে মার্‌বার তোমাদের কি অধিকার রয়েছে—?

প্রশ্নটা কঠিন ; জবাবও তারা সহজে দিতে পার্‌লোনা। একজন বাঙ্গালী দারোগা ছিল—গোড়াদের সঙ্গে। সে একটু মোলায়েম ক'রে ব'ল্‌ল, এখন আর কি করা যায়, যা হবার হ'য়ে গেছে ; এখন এর শুশ্রুষার ব্যবস্থা করা যাক্।

সবাই মিলে বুড়োকে ঘরে নিয়ে গেল।

এমন সময় সাধারণ পোষাক পরা একজন বল্‌ল, আম্‌রা তো এ'কে নিয়ে আছি—এদিকে যে, আমাদের কর্ত্তব্যের অবহেলা হোচ্ছে—বাড়ীটা তো সার্চ্চ করা উচিত।

দিদি ব'ল্‌লেন, তার মানে ! আমার বাড়ীতে খানাতল্লাস কেন ?

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ব'ল্‌লেন, এবাড়ীতে একজন ছাত্র ঢুঁকেছে, তাকে আম্‌রা চাই।

আপনার বুদ্ধির তারিফ কর্‌তে হয়। তানাহ'লে এ অসময়ে ভদ্র লোকের বাড়ী ঢুকে উপদ্রব কর্‌বেন কেন ? আপ্‌নারা এখান থেকে এখন যান ; 'Police Commisioner'এর অর্ডার নিয়ে কাল আস্‌বেন—সঙ্গে পাড়ার কাউকে নিয়ে আস্‌বেন। এখন যান, আমার দরজা বন্ধ কর্‌তে হ'বে। দিদি দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুলিশের দল বেগতিক দেখে আর বাক্যব্যয় না-ক'রে বেরিয়ে গেল।

[৪]

উপরোক্ত ঘটনার পর, কয়েকদিন কেটে গেছে। বুড়ো চাকর মোহন সেদিন উঠে বসেছে। কাজেই একদিকে দিদি যেমন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, অপর দিকে আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আশা ও শঙ্কায় তাঁর মন কেঁপে ওঠে। সংসারের কাজ-কর্ম্ম করেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বদা মন প'ড়ে থাকে সদর দরজার দিকে। দিদি সকলেরই দিদি, কাজেই তার পরিচয় বড় বেশী কেউ রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রেনি। মোটামুটি এইটুকুন জানা যায় যে, তাঁর শ্বশুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, এবং প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। তার স্বামী রেঙ্গুনে বড় চাক্‌রী কর্‌তেন—কিন্তু অল্প বয়সে মারা যান। শ্বশুর বড় পুত্রবধুর জন্য কলকাতার বাড়ী আর মোটা টাকা রেখে যান। মর্‌বার সময় স্ত্রীকে ডেকে বলেন যে, অরুনাকে তিনি দেশের বাড়ীর কোন অংশ লিখে দিয়ে গেলেন না। কিন্তু সে যদি কোনদিন দেশের বাড়ীতে যায়, তবে তাকে আমার ঘরেই থাক্‌তে দিও।

সে হ'তে অরুনা কলকাতার বাড়ীতে শ্বশুরের ভৃত্যকে নিয়ে আছেন। অরুনা ভারতের সনাতন আদর্শের মধ্যেই নিজেকে নিয়োগ করেছেন—যদিও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠে স্তোত্রপাঠ করেন, ধ্যান করেন, শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। এ-সব ক'রে যখন সময় হাতে থাকে—লেখা পড়া করেন। কোন ছিদ্র-পথ ধ'রে পাছে বিলাসিতা শরীরে কিম্বা মনে প্রবেশাধিকার পায়—সে বিষয়ে তিনি সজাগ। স্বপাক খান এবং বুড়ো মোহনও দিদির অনুকরণে নিরামিষ খায়।

সেদিন দুপুরে অরুনা চিঠি পেলেন। দেবর অমল লিখেছে চিঠি। সে লিখেছে স্ত্রী মলিনা আর মা-কে নিয়ে কাল আস্‌ছে।

একমাত্র চাকর সেও অসুস্থ। কাজেই অরুনা অত্যন্ত বিব্রত হ'লেন। গত্যান্তর না দেখে পাশের বাড়ীতে দুপুরেই হাজির হ'লেন। তাঁকে এসময়ে দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গেল! ব্যাপার বিশেষ কিছুই না—তার বাজারটা যেন তারা তাদের চাকর দিয়ে এনে দেয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে অরুনা ওপরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কানু এসে হাজির হ'লো। অরুনা বল্‌লেন, তোমায় ভাই আমার একটু কাজ ক'রে দিতে হ'বে। এই যে ফর্দ্দ—এ জিনিষগুলো কিনে দিতে হ'বে।

কানু বল্‌ল, সে জন্যইতো এসেছি। মা পাঠিয়ে দিলেন। এনেদিচ্ছি এখুনি, সে জন্য অত ভাব্‌না কিসের?"

পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে কানু বল্‌ল, তুমিতো দিদি খুব পড়াশুনা করো! আশ্চর্য্য! তোমার কোন ডিগ্রীর ছাপ নেই!

অরুনা এ কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু ব'ল্‌লেন, এই ফর্দ্দ, তুমি ভাই চট্‌ ক'রে এসোগে।

কানু বল্‌ল, আচ্ছা দিদি, 'ডিগ্রীর' বড়ো ছাপ থাক্‌লেই কি তাকে পণ্ডিত বলা যায়?"

কেন—কি হোয়েছে?

'Economics'এর নতুন প্রফেসর এসেছেন আমাদের কলেজে। পণ্ডিত বলে তার বেশ নাম। জীবনে কোন পরীক্ষায়ই নাকি প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি কোনদিন। কিন্তু হ'লে কি হ'বে পড়াতে পারেন না।

তার মানে?

তার মানে পড়াবার ধরণ এমনি বাজে, যে শুন্‌তে ইচ্ছে করে না ওঁর লেক্‌চার।

আমার মতে প্রফেসরদেরও পরীক্ষা নিয়ে কাজে বহাল করা উচিত। সব ব্যাপারে পরীক্ষারপর পরীক্ষা—কিন্তু যাদের হাতে শিক্ষার ভার র'য়েছে, তারা সে-কাজ চালাতে পারবে কি-না সে-পরীক্ষা নেয়া হোচ্ছে না। এ ব্যবস্থা যদি হ'তো তা হলে দেশের এ অবস্থার মধ্যেও ছেলেরা অনেক বেশী শিখ্‌তো—দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাও বেড়ে যেতো

নিজের মতের সঙ্গে দিদির মত মিলে যাওয়ায়, কানু উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল, আজ্‌কে আমরা কি করেছি জানো দিদি, সে প্রফেসরকে—

তুমি এখন চট্‌ ক'রে এসোগে ভাই। আরতো বেশী সময় নেই। ওরা আসার আগেই সব গুছিয়ে ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হ'বে।—দিদি কানুর গল্পটা চাপা দিলেন। কানু চলে গেলে, ঘরের জিনিষ পত্র গুছান গাছান নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দরজায় ঘোড়ার গাড়ী থামার শব্দ হ'লো। অরুণা এগিয়ে গিয়ে সবাই কে অভ্যর্থনা ক'র্‌লেন। শ্বাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে, অমলের কুশল প্রশ্ন ক'রলেন। মালপত্র ওপরে তোল্‌বার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হ'লেন।

শাশুড়ী ভেতরে ঢুকেই দেখেন মোহন বিছানায় শুয়ে আছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে সব খবর তিনি মোহনের কাছ থেকে জেনে নিলেন। মোহন অবশ্য সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপ্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। অরুণার সেবা যত্নের উল্লেখ ক'রতেও ভোলেনি।

অরুণার শ্বাশুড়ী ব্যাপার শুনে চটে মটে আগুন। অরুণাকে ডেকে ব'ল্‌লেন, এ সব কি অনাসৃষ্টি বৌমা! তোমায় না বারণ করে

দিয়েছি অনাথের সঙ্গে মেলা মেশা ক'রতে? ঐ ছোঁড়াকে বাড়ীতে ঢুঁক্‌তে দেও কেন? বলি পুরুষের সঙ্গে এতো ঢলাঢলি কেন?

মা-র চড়া গলা শুনে অমল ছুটে এলো। বড়ো চাকুরে, উচ্চ শিক্ষিত আর মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন, অমল চেঁচামিচি বরদাস্ত ক'রতে পারেনা। রুক্ষস্বরে বল্‌ল, আবার কি হ'লো মা?

হ'বে আর কি ছাই—আমার মুণ্ডপাত হয়েছে। যতো-সব অনাসৃষ্টি—কালে কালে কি যে সব হোচ্ছে—

আরে খুলেই বলোনা কি হয়েছে?

এ সব কথা খুলে বলা যায়? নাম-নেই ধাম-নেই—কোথাকার কোন ছোঁড়া রাত-দিন পড়ে থাকে এ বাড়ীতে। আবার মোহনকে নাকি ঠেঙ্গিয়েছে।

কে আসে ব'ললে নাতো?

আমি কি চিনি তাদের? জিজ্ঞেস করো বাড়ীর মালীককে—আমরা তো এ বাড়ীর কেউ নই। শ্বাশুড়ী চলে গেলেন।

অমল অরুণাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ল, মা কাদের কথা বল্‌ছিলেন?

অরুণা এতক্ষণ নির্ব্বিবাদে শ্বাশুড়ীর গালীবর্ষণ সহ্য করেছেন। ঐ সমস্ত কথার প্রতিবাদ ক'রতেও তিনি ঘৃণা বোধ করেন। জীবনের নানা জঞ্জালের মতো এ অন্যতম জঞ্জাল—যা সহ্য করতেই হ'বে। কিন্তু অমলের প্রশ্নে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। বেশ সহজ ও দৃঢ় কণ্ঠে বুঝিয়ে দিলেন অল্প কথায়। অনাথ তার দাদার বন্ধুর ছেলে। রেঙ্গুণে তারা এক বাড়ীতে ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ সে-বন্ধু ও তার-স্ত্রী তাদের অভিভাবকের মতো ছিলেন। প্লেগে স্বামী স্ত্রী এক দিনেই মারা যান। মর্‌বার সময় শিশু পুত্রটিকে আমাদের হাতে সপে দিয়ে যান সে

দিনকার শিশুই এই অনাথ। অনাথ মাঝে মাঝে আসে তার দিদির খবর নিতে।

অমল কি জানি বল্‌তে যাচ্ছিল—মা ঘরে ঢুক্‌তেই আর বলা হলো না। তিনি বল্‌লেন, এতো বড়ো ছেলের—দিদি! এসব নেকামী সহ্য হয় না। এখন যাও তো দেখি দেবী-চৌধুরাণী, গল্প রেখে খোকাকে কিছু খেতে টেতে দিতে পার কিনা।

পেছন ফিরে ফিরে বার বার বল্‌তে বল্‌তে চল্‌লেন—রাতদিন গল্প, আর গল্প!

অরুণা শ্বাশুড়ীর কথা যেন শুন্‌তেই পায়নি এমনি ভাব দেখালেন। স্বাভাবিক কণ্ঠে বল্‌লেন, ঠাকুর পো, আপনার জন্য পশ্চিমের ঘরটা ঠিক ক'রে রেখেছি। বাড়ীর মধ্যে সে ঘরটাই ভাল—আলো বাতাস বেশ পাবেন। আপনি ঘরে যান, আমি খাবার নিয়ে আস্‌ছি।

দূরে মলিনা দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁহাকে সাহায্য ক'রতে ব'লে, অরুণা আস্তে আস্তে জিনিষ পত্র ধরাধরি ক'রে ওপরে উঠাতে লাগ্‌লেন। তারপর মলিনাকে ওপরে পাঠিয়ে, নিজে অমলের জন্য খাবার আন্‌তে গেলেন।

মলিনা ও অমল কি যেন কথা বল্‌ছিল, অরুণাকে খাবার নিয়ে আস্‌তে দেখে চুপ্‌ ক'রে গেল।

টেবিলের ওপর খাবার রাখতে রাখতে, অরুণা, মলিনাকে বল্‌লেন, ঠাকুরপোকে এক গ্লাস জল দেও না ভাই। জল দিয়ে—চল নীচে যাই। তোমায় কিছু মুখে দিতে হবে।

অমল অরুণার সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছিল, এখানে কি মাছ ভাল পাওয়া যায়, কি তরিতরকারী তার ভাল লাগে ইত্যাদি। এমনি সময় মলিনা জলের গ্লাস নিয়ে এলো।

মলিনার হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা নেবার সময়, কাঁচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। অমল গ্লাসটা ধর্‌তে যাচ্ছিল ঠেলা লেগে প্লেটটাও ভেঙ্গে গেল। নিজের অন্যমনস্কতার জন্য সে ভেঙ্গেছে গ্লাস আর প্লেট কিন্তু চট্‌ল—স্ত্রী মলিনার ওপর। বল্‌ল,—নুলা—

আমি কি কোরব, তুমিইতো ধ'র্‌তে পার্‌লে না।

কেন তোমার হাত কি পঁচে গেছে! না কুষ্ঠ হয়েছে?

জানইতো আমার হাতে ব্যথা।

ব্যথা!—ব্যথা! ব্যথা! আর সহ্য হয় না। মরনা কেন—এক দিনে সব লেঠা চুকে যায়।

অরুনা বাঁধা দিলেন। ছিঃ! ঠাকুর পো, অমন ক'রে বল্‌তে আছে? শত হ'লেও নিজের স্ত্রী।

ব'লে অরুণা নীচে নেবে গেলেন। শ্বাশুরীকে বল্‌ল, মা তোমায় একটু খাবার দি' এখন?

শ্বাশুরী ঠাকুরাণীর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, নিজেই একটা পিড়ি পেতে, বল্‌ল, মা এবার আপনি বসুন।

অরুনা শাশুড়ীকে পরিবেশন ক'র্‌ছিল। খেতে খেতে শাশুড়ী ব'ল্‌লেন, দেখো বৌমা—একটী কথা। অনাথের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় ক'রে দাও আমায়। দেশের পুকুরটা না কাটালেই নয়। এবার খাজনা' পত্তোর মোটেই আদায় হয়নি। অথচ পুকুরটা না কাটালেই নয়।

অরুনা বল্‌ল, অনাথ টাকা পাবে কোথায়?

কি-যে বলো! অনাথের আবার টাকার অভাব। রাতদিন যে এতো চুরি ডাকাতি কর্‌ছে, তার আবার টাকার অভাব? তুমি ব'লেই দেখো। আমার হয়ে একটি বার বলো তুমি।

এই বলে শ্বাশুরী, অরুণার দিকে একবার তাকালেন তারপর একটু পরে যেন নিজের মনেই বল্‌লেন, ব্যাটা চাষাদের ঢং দেখে আর বাচিনে। কর্ত্তাদের সময়, এত তেজ কোথায় ছিল? এখন কথায় কথায় বলে—দেবনা আমরা খাজনা—এতকাল জমিদাররা আমাদের রক্ত শুষে নিয়েছে—আর না—এই পর্য্যন্ত, দেখি আমাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়ায়। দেশের সত্যিকারের মালিক আমরা আর আমাদেরই উপরই এত জুলুম—শোন দেখি মা তাদের কথা।

অরুণা নির্ব্বাক স্তম্ভিত হয়ে, বাইরের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, চেয়ে রইল। কথাগুলো যেন তার কাণে গেলনা। সে যেন এরাজ্যে আর ছিল না। কোথায় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিসের সন্ধানে কে-জানে।

শ্বাশুরী আবার বল্‌লেন, কি বৌমা—গরীবের কথা কানে গেল? হ'বে কিছু ফল—না অরণ্যে রোদন?

অরুনা এবার শাশুরীর কথায় চম্‌কে উঠ্‌ল। তারপর একটু চিন্তা ক'রে বল্‌ল, আচ্ছা আমি আপনার টাকা দেবো।

বিকেলে অমল স্ত্রী ও মাকে নিয়ে বেড়াতে-গেছে—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অরুনার কাজে মন বসেনা। এমন সময় এলো অনাথ। তার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে—যেন অনেকদিন খায়নি, অনেকদিন ঘুমোয়নি।

অরুনা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বল্‌ল, কি ব্যাপার অনাথ, তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন—কি হোয়েছে?

নিতাই, হাবু, ত্বেজেন, গনেশ, রথীন্দ্র সবাই ধরা পড়েছে। আমার দিন-ও ঘনিয়ে এসেছে। আমার জন্য কিছু নয়, ওদের জন্যই বড়ো কষ্ট হয়।

অরুনা নির্ব্বাক। এতো বড়ো আঘাতের জন্য সে যেন প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু প্রথমে সামলাতে না-পেরে, অরুণার অজ্ঞাতে চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এল। পরমুহূর্ত্তে সেই ভাব কাঁটিয়ে, কিছুই যেন হয়নি এম্‌নি ভাবে খবর-টাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন, অনাথ কিছু খাবে? আজকে অনেক খাবার আছে। মারা এসেছেন কিনা।

অনাথের খাওয়ার প্রবৃত্তি থাক্‌তে পারে না—যদিও সমানে দুদিন কিছুই পেটে পড়েনি। কিন্তু দিদি খাবার প্লেটটা সাম্‌নে এনে দিলেন পর, সেটা উপেক্ষা ক'র্‌তে পারল না। সে মাথা নিচু ক'রে খেতে লাগল—সাম্‌নে দিদি বসে দেখ্‌ছিলেন।

অনাথ খাবার শেষ ক'রে দেখে, দিদি অপলক নয়নে চেয়ে আছেন— নিঃশেষিত খাবারের প্লেটের দিকে। আর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পর্‌ছে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে—আস্তে আস্তে দিদি বল্‌লেন, আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় চিরদিন রক্ষা কর্‌বে। এটা আমি বিশ্বাস করি।

বলে, তিনি হঠাৎ উঠে চলে গেলেন; একটু পরেই ফিরে এসে অনাথের হাতে একটা পুট্‌লি দিলেন।

এটা কি?

সামান্য কিছু টাকা। তোমার দিদির দান—নিতেই হ'বে।

টাকা! টাকার আমার প্রয়োজন হবেনা। তোমার আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিচ্ছি। পূজোর নির্ম্মাল্যের মতো নিচ্ছি। এ থেকে বড় আর কি থাক্‌তে পারে?

অনাথ টিপ্‌ ক'রে দিদির পায়ের ধূলো নিয়ে দ্রুত গেট্‌ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটিবার ফিরে তাকাতেও পার্‌লে না।

অনাথ চলে গেল। নির্জ্জন বাড়ীতে অরুনা একা। জীবনের অনেক বৎসর তার একা কেটেছে—কিন্তু সেদিনের মতো এতো নিঃসঙ্গ কোন দিনই বোধ করেননি।

রাত হয়েছে,—আঁকাশে তারার মেলা বসেছে। অনন্ত আকাশ আর অসংখ্য তারার পানে চেয়ে আছেন অরুনা। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য তারার মতোই কোটী কোটী মানুষ ছুটে চলেছে। সীমাহীনের মধ্যে অনাথ কোথায় গেল—তাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? কেন এ দুঃখ?—এইতো প্রকৃতির নিয়ম।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের দিনে নেতাদের মধ্যে যে-মনোভাবের অভিব্যক্তি হ'য়েছিল—সে-মনোবৃত্তির প্রকাশ হোল—স্বতন্ত্র ভাবে, গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে। অসহযোগ আন্দোলন দেশের জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কারণ এ আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ভারতের সনাতন ভাবধারার ওপর। কাজেই এদেশের জনসাধারণ এ আন্দোলনের মধ্যে, সত্যিকারের কল্যাণ কতটা রয়েছে সে-বিষয়ে যাচাই ক'রে দেখবার প্রয়োজন পর্য্যন্ত মনে করেনি। দেশের জনসাধারণের সনাতনের প্রতি এম্‌নি আস্থা। সনাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জীবনের সর্ব্ব-ব্যাপারেই। সেই স্মরণাতীত কালের আদর্শ চোখের সামনে ধরে ভারতের বেশীরভাগ লোক আজও আর অন্যকোন সত্যকে মেনে নিতে অক্ষম। বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে প্রভাব হ'তে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই।

অতিথিকে সুখী ক'রতে দাতাকর্ণ নিজের পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে ক'রে, গনিকালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৈরাগ্য সাধন, ব্রহ্মচার্য্য আশ্রম, ; এ সমস্তই ভারতের চিরন্তন প্রথা। এই পথেই ভারতের মুক্তির সংগ্রাম। এই সনাতন পথেই চ'লেছিল ভারতের চিন্তা আর কর্ম্মপ্রচেষ্টা। কিন্তু এ চিরাচরিত চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান একদল মনিষী। তারা বললেন, অতি সংযম অসংযমেরই নামান্তর। তাদের মত, সনাতন আদর্শ আঁকড়িয়ে ধরে বিংশসতাব্দীতেও, দেশকে গড়ে তুলবার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তার চাইতে কালের তালে তাল ফেলে, যে সমস্ত দেশ জগতে এগিয়ে চলেছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে, সত্যিকারের মুক্তি পাবো। দেশ যদি, জগতের

নিকট পরিচয়ের জন্য অনুকরণ প্রিয় হ'য়ে পড়ে, তবুও দেশের জাতিগত উন্নতির দিক্ দিয়ে শুভই ব'লতে হ'বে—ইত্যাদি।"

এই গড়মিলে, জাতির প্রাণপ্রবাহ ব্যাহত হল, জাতি পঙ্গু হ'ল, জাতির বাঁচবার নেশা টুটে গেল। (জাতিয়জীবনের এই হেরফের, বুদ্ধির শাসনদিয়ে, কোনপ্রকারেই উপেক্ষাকরা গেলনা। কাজেই গড্ডালিকা প্রবাহের মতো, দেশেরলোক, কোথায় কি ভাবে ভেসেগেল, তা তারা নিজেরাও বুঝতে পার্‌ল না। দেশের জন সাধারণ খেই হাড়িয়ে ফেল্‌ল।

বাংলার জাতীয়জীবন যখন ঐ রকম ছন্নছাড়া, ঠিক সে সময়কার এক বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে এক যুবক চলেছে আসানসোলের জনবিরলপথ দিয়ে। চারিদিকে রৌদ্র খাঁ খাঁ ক'রছে, মনে হয় যেন মাটির বুক হ'তে আগুন বেরিয়ে আস্‌ছে, কোথায়ও একটা গাছ নেই। যতদূর দৃষ্টিযায়, কেবল, অনুর্ব্বর ফাঁকা মাঠছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। চোখের দৃষ্টিকে তৃপ্তি দেবার মতো, নিকটে বা দূরে কিছুই নেই। শুধু মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত কয়লার খনি

শ্রান্ত পথিক কখনও সঙ্গের পুট্‌লীটা ডান কাঁধ হ'তে বাম কাঁধে নিচ্ছে, আবার বাম কাঁধ হ'তে ডান কাঁধে নিচ্ছে—আর এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কর্ম্মরত সাওতালদেব সঙ্গে দেখা হয়। তারা কেউ কেউ তারদিকে একবার তাকিয়ে কাজে মন দেয়। অনেকের একবার তাকাবারও ফুরসৎ নেই। কর্ম্মজগতে এতো সময় কোথায়? সন্ধ্যার পরেই যে আবার তাদের হিসেব দিতে হ'বে। তখন মাপের একচুল এদিক ওদিক হ'লেই কর্ম্মকর্ত্তা, পারিশ্রমিক দেবে না। হয় ত বল্‌বে "কালকে সমস্ত কাজ শেষ ক'রে পয়সা নিও"। অথচ তার ঘরে রুগ্ন ছেলে, অভুক্ত স্ত্রী, তারই পথ চেয়ে আছে। বাঁচা আর কাজ, কাজ আর বাঁচা এই

নিয়েই তাদের জীবন। আশা নেই, আকাঙ্খা নেই—আনন্দ নেই—শুধু প্রাণ ধারনের গ্লানি। চোখে মুখে সে গ্লানি ফুটে উঠেছে।

পথের ধারেই সেকেলে ধরনের একটী বাংলা—সামনে একটী ফুলের বাগান। ছোট বাড়ীটী কিন্তু চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে। প্রত্যেকটী জানালায়, আর দরজায় ফিকে রংয়ের পর্দ্দা ঝুলছে। বাড়ীর বাইরে থেকেই বেশ বোঝা যায়—বাড়ীওয়ালা সৌখীন লোক।

এখানে এসে পথিক থাম্‌ল। তারপর, অতি সঙ্কোচে বাইরের গেট্ খুলে ভেতরে ঢুক্‌ল। গেটের দরজা খোলার শব্দে গৃহস্বামী ঘর হ'তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পথিক কোন কথা না ব'লে, পকেট হ'তে একটা চিঠি বের ক'রে গৃহস্বামীর হাতে দিল। তিনি সে চিঠির শিরোনামা দেখে, চিঠিটা খুলে ফেল্‌লেন।

এমন সময়, একজন মধ্যবয়সী মহিলা—সুন্দর বলা যেতে পারে; পাশে এসে দাড়িয়ে বল্‌লেন, হ্যাগা, কে চিঠি লিখেছে?

অচিন্ত লিখ্‌ছে "ভাই উমেশ, আজ্‌কে বহুদিন পরে তোমায় চিঠি দিচ্ছি। এই পত্রবাহককে যদি কোন কাজ কর্ম্ম দিতে পার, তবে অত্যন্ত সুখী হ'ব। আশা করি ভাল আছ।

মহিলাটী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চিঠি পড়া শেষ ক'রে উমেশবাবু স্ত্রীর দিকে তাঁকিয়ে বল্‌লেন, কি কাজ একে দেওয়া যায় নীলিমা? এখন ত আর খনিতে কোন কাজকর্ম্ম খালি নেই।

নীলিমা বল্‌ল, বেশ ত এখন আমাদের এখানেই থাক্‌না। পরে যা-হয় একটা কাজকর্ম্ম দেখে দেওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর, উমেশ বাবু বাড়ী ফিরে চা খাবার সময় নীলিমাকে বল্‌লেন, চাকরটা কাজকর্ম্মে ভাল হ'বে বলেই মনে হচ্ছে। একবেলাতেই সাম্‌নের বারান্দার চেহারা রদ্‌লে দিয়েছে।

দিন কেটে যায়। নিপুন হাতে অনাথ ঘরের প্রায় সব কাজই করে। এমন কি সংসারের, ব্যয় সংক্ষেপ করার দিকেও নজর দিয়েছে। কারো ধরবার সাধ্য নেই যে, অনাথ জীবনে আর কোন দিন বাসার চাক্‌রী করে নি। তার কাজ দেখে মনে হয়, যেন এতোকাল সে বাসার কাজের অধ্যবসায়েই কাটিয়েছে।

সেদিন বিকেল-হতেই টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়্‌ছিল। উমেশবাবু নীলিমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন নি। বারান্দায় আরাম কেদারায় শুয়ে, খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নীলিমা সাম্‌নে বসে সেলাই কর্‌ছিলেন।

হঠাৎ উমেশ বাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে ব'ল্‌লেন অনাথকে আমার কেমন যেন লাগ্‌ছে। ওকে কিছুই বোঝা যায় না—তোমার কি মনে হয়?

নীলিমা সেলাই থেকে মুখ তুলে বল্‌লেন, খবর নিলে না কেন? একজন লোককে বাড়ীতে জায়গা দেবার আগে, সব রকমের খবরই মানুষ নিয়ে থাকে।

নীলিমার শেষের দিকের কথায় উমেশ বাবু একটু বিচলিত হলেন। তারপর বললেন, সেটা যে তুমিই ক'র্‌বে না, তাত আমি ভাবি নি।

নীলিমা কোন উত্তর দিল না—সেলাই কর্‌তে লাগল।

উমেশবাবু কিছুক্ষণ পরে ব'ল্‌লেন, ছেলেটীকে একটু মিস্‌টিক্‌ বলে মনে হয়। তাই না নীলিমা?

নীলিমা স্বামীর দিকে চাইল। পরে বল্‌ল, আমার মনে হয়, আমরা, ওর সম্বন্ধে ধারনা ভুল করেছি। ও চাকরদের Class এরই নয়।

গম্ভীর হ'য়ে উমেশবাবু ব'ললেন, তবে, তোমার কি মনে হয়?

মনেহয়—উচ্চবংশীয়। কিছুইত ভেঙ্গে বলে না। তবে, মাঝে মাঝে দুই একটা কথা বোঝাযায়, যে সে শিক্ষিত। কোন দৈবদুর্বিপাকে পড়ে আমাদের এখানে এসেছে।

উমেশবাবুকে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল। অনেকক্ষণ কিছুই বল্‌তে পা'র্‌লেন না। শেষে বল্‌লেন, ভালো ক'রে খোজ নিতে চেষ্টা করো না কেন ?

সন্ধান নিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু অনেক সময় খেই পাই না। এক এক সময় মনে হয়, অনাথের এককালে হয়ত অনেক টাকা পয়সাও ছিল।

সেলাই হ'তে মুখ তুলে ব'ল্‌ল, ছেলেটী অবিষয়ী। এমনও হ'তে পারে, যে তার কোন গোলযোগ হয়েছে। সোজা পথে চল্‌তে গিয়ে, কারোও ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। কেন যেন মনে হয় ওর কোন বড় ব্যবসা ছিল।

উমেশবাবু অবাক হয়ে নীলিমার দিকে একবার, তাকালেন, তারপর আবার চোখ বুঝে পড়ে রইলেন।

পুরে বল্‌লেন, অল্পমূলধনে অনেক ছেলেরা ব্যবসায় নেবেছে। এমনও শোনা যায় যে, জনসাধরনের টাকা নিয়ে যারা, ব্যাঙ্ক খুলে ব'সেছে, তারা লোভ সম্বরণ না ক'রতে পেরে, অনেক সময় সেই সমস্ত ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে, বন্দবস্ত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছে—নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। পরে অংশীদারদের নিকট সে প্রতারণা ঢাঁক্‌বার জন্য, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের অনেক রকম বিপদে ফেলেছে।

নীলিমা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল, জনসাধারণের টাকার এরূপ অপব্যয় ? দেশে আইন কি নেই ?

আইনেরও ফাঁক আছে নীলিমা। ভুলে যাচ্ছ তুমি, মানুষের মনোবৃত্তির সঙ্গে কর্ম্মপদ্ধতির মিল আজকাল খুব কম দেখা যায়। সে সততা আমাদের দেশ হ'তে অনেক দিন হ'ল উঠে গেছে।

সে সন্ধ্যায়, অনাথের কথা নিয়েই স্বামী স্ত্রীতে আলোচনা চল্‌ছিল। এমন সময় এলো বিনয় কুমার বন্দোপাধ্যায়। বিনয় কুমারের চাল চল্‌তি উগ্ররকমের সাহেবী। কয়েক বৎসর বিলেত ছিল। সে সম্বন্ধে নিজে যেমন সজাগ পরকেও সজাগ ক'র্‌তে ব্যস্ত। এমনি তার বুদ্ধি যে, ভেজালটাকেই আসল ভেবে সে গোগ্রাসে গিলেছে। কাজেই সেখানকার শিক্ষার বদহজমের উদ্গারে দেশের সমাজ অতিষ্ট হোয়ে উঠেছে।

রেইন্‌কোট্‌টা খুল্‌তে খুল্‌তে বিনয় বল্‌ল, হেলো উমেশ!—বৌ'দি! তোমরা খুব অবাক হ'য়ে গেছো দেখ্‌ছি? অনেক দিন আমার ইচ্ছে—কিন্তু সময় ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। চার পাঁচ দিনের ছুটি জুটে গেল, তাই এলাম।

বিনয়কুমার উমেশবাবুর বাবার বাল্যবন্ধুর ছেলে। এ পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ট। বিনয়ের পিতা কোন সওদাগরী আফিসে কাজ ক'র্‌তেন। অতিকষ্টে তিনি ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষার জন্যে। উচ্চ শিক্ষা কি পেয়েছে, সেই জানে। তবে সাঁহেবী যথেষ্ট শিখেছে। বিলিতি একটা বিয়েও করেছিল। দেশে ফিরে, ফের বিয়ে ক'রে। বিলিতি বিয়েও নাকচ হ'য়ে গেছে। দিশীবিয়েটাও টেঁক্‌লনা। কন্যাপক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ক'রে ভাতা আদায় ক'রে নিয়েছে।

রাত্রে খাবার টেবিলে আলাপ হোচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে, নীলিমা আর বিনয় কুমাবের সঙ্গে তর্ক উঠ্‌ল, পুরুষ ও নারীর তুল্য অধিকার নিয়ে। তর্কটা প্রকট হ'য়ে উঠল বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে।

নিলীমা সহজভাবে বল্‌ল, আর যাই বলুন বিনয়বাবু, যে-স্বামী, স্ত্রীকে ত্যাগ কর্‌তে পারে—সে স্বামীর অন্নে-বস্ত্রে বেঁচে থাকার চাইতে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।

নীলিমার কথা শুনে বিময়কুমার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। টেবিল চাপড়িয়ে বল্‌ল, কিন্তু যাবে কোথা? না নিয়ে মেয়েদের উপায় আছ? কুকুরকে মার্‌লেও সে গৃহস্বামীকে ত্যাগ করে না। একটু আহ্লাদ ক'র্‌লেই সে সব ভুলে যায়। কাজেই গৃহস্বামীর বাড়ী পাহাড়া দেওয়া বন্ধ থাকে না।

বিনয়ের কথা শুনে ব্যথায় নীলিমার চোখ দিয়ে জল গড়্‌তে লাগল। বিনয়ের কথার মধ্যে রয়েছে আঘাত, হাসিতে রয়েছে বর্ব্বরতা। নীলিমা বল্‌ল, আপনার কথার জবাব দিতে আমি চাই নে। কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর্‌ছি যে, মেয়েরা যেন তাদের অপমান সহ্য না-করে। ভগবান যেন তাদের মনো-বলে বলীয়ান ক'রে তোলেন। একবার যদি নিজেদের উপর বিশ্বাস আন্‌তে পারে, তবে ভেঙ্গে যাবে—যে শৃঙ্খল পুরুষ তাদের হাতে পায়ে পড়িয়ে দিয়েছে। আপনার এ হাসির পাল্টা জবাব সেদিন দেয়া যাবে।

নীলিমার কথায় বিনয় হঠাৎ একটু দমে গেল। ভাব্‌তে পারেনি কোন মেয়ে ওরকম বল্‌তে পারে।

বিনয়কে নীরব দেখে নীলিমা বল্‌ল, পুরুষ মেয়েদের অফিংয়ের নেশায় মাতিয়ে রেখেছে— বাক্ চাতুর্য্যে আর নানা ফন্দি এঁটে। মেয়েরা যেদিন নেশার ঘোর কাঁটিয়ে উঠ্‌বে, সে দিন আর তাদের, একমাত্র ভোগের বস্তু ব'লে গন্য করা চল্‌বে না

বিনয় হঠাৎ হাট্‌বার ছেলে নয়। তাই বল্‌ল, মেয়েদের আর কোন সত্ত্বা আছে?

আপনাদের কলুষিত দৃষ্টিতে কিছুই কি পড়ে না? ছলে, বলে, কৌশলে সেই কলুষিত মনোবৃত্তি চরিতার্থ ক'রবার একমাত্র চেষ্টা। নিজেদের স্বার্থের জন্য, কত উপদেশ কত সাজ সজ্জা, কত নীতি-বাক্য,

কত শাসন, কত পতি পরম-গুরুর-মাহত্ত্ব দিনরাত্ চল্‌ছে—যেন মেয়েরা কোন দিন মোহমুক্ত হ'তে না পারে। নিজেদের সত্ত্বা যাতে কোনদিন উপলব্ধি ক'রতে না পারে।

বিনয়কুমার অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্‌ল, তাতে ক্ষতি হয়েছে কি? সমাজের কল্যানই হয়েছে।

নীলিমা ব'ল্‌ল, কল্যানের অর্থ যদি আপনারা বুঝতেন, তবে ঐ কল্যান শব্দটা আপনার মুখে শোভা পেতনা।

উমেশবাবু এ সব তর্কে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি অবাক্ হ'য়ে সমস্ত শুন্‌ছিলেন। এবার তিনি উঠে আলোটা একটু বাঁড়িয়ে দিলেন।

নীলিমার কথায় বিনয় অত্যন্ত চটে গিয়েছিল। বল্‌ল, শিক্ষাটা তবে আপনাদেরই কাছ হ'তে নিতে হবে?

নীলিমা বিনয়ের এ আক্রমণ হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল, তাতে ক্ষতি কি বিনয়বাবু, যদি পুরুষরা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে চ'লে।

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, কবে কোন যুগে সমাজের বিধি ব্যবস্থা হ'য়েছিল, তার কি পরিবর্ত্তন হ'বে না? চিরকালই কি সে সনাতন বিধান, অচলায়তনের মতো হ'য়ে থাক্‌বে? আর কোন সত্য তার স্থান অধিকার ক'র্‌তে পার্‌বে না।

তারপয় বিনয়কুমারের দিকে তাঁকিয়ে বল্‌ল, ঘৃণার মূলধনের উপর যে সমাজের ভীত—সেতো নড়বেই। এর ওপর গড়ে উঠতে পারেনা প্রাণ, বাঁচতে পারে না জাতি। একদিন না একদিন সব ভেঙ্গে যাবেই। পুরুষ মেয়েদের পেঁছনে টেনে রেখে নিজেরাই কি লাভবান হ'তে পেরেছে? আপনিই বলুন আপনাদের কি শক্তি আছে? সামান্য, চোখের সাম্‌নে, নারীহরণ দেখ্‌লেও—দুর্ব্বৃত্তদের সঙ্গে আপনাদের

বোঝাপরা করার শক্তি আছে? মনে করবেননা সে লজ্জা নারীর। সে লজ্জা আপনাদেরই।

বিনয় ধৈর্য্য হাড়িয়ে বল্‌ল, লেখাপড়া তো কিছু করেন নি, কেবল আবোল তাবোল ক'তগুলো বড়ো বড়ো বুলি ব'লে গেলেন। এ ভাবপ্রবনতার মাঝে কোন যুক্তি তর্ক চলে না।

আপনাদের যুক্তিই যে একমাত্র যুক্তি, আর কারো কোন যুক্তি থাক্‌তে পারে না, এ হ'তেই পারে না। এতে রাগ কর্‌বার কিছু নেই, বিনয়বাবু। শুধু নিজেদের বড় করার আস্ফালনের কোন মূল্য নেই। ছোট-বড়ো সব-কিছু কার্য্য ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। সত্যিকারের বড়ো যারা, তাদের সংস্পর্শে এসে ছোটও বড়ো হয়ে যায়। শক্তিমান দুর্ব্বলকে টেনে নিয়ে আনন্দ পায়! এটাইতো বড়োর ধর্ম্ম। কিন্তু বড়োর সে পরিচয় পুরুষ আজও দিতে পারেনি।

বিনয় আগেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিল। সে অধৈর্য্য হয়ে যা তা ব'লে নিজেই ঘায়েল হোচ্ছিল। কিন্তু সে তর্ক কর্‌বেই। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে আর কথা বাড়াতে চাইলে না। বল্‌ল, যাক্‌গে আপনার সঙ্গে বাজে তর্ক ক'রে energy নষ্ট ক'রতে চাইনে। আমার ঘুম পেয়েছে।

ব'লে বিনয় উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘরে, আড়ালে দাঁড়িয়ে, অনাথ সব শুন্‌ছিল। সেও চাইছিল এ প্রসঙ্গ ক্ষান্ত হয়। কাজেই ঘরে ঢুকে বিনয়কে বল্‌ল, আপনার বিছানা তৈরী আছে, আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

বিনয় অনাথের সঙ্গে চলে গেল। নিলীমা ও উমেশবাবু নিজেদের শোবার ঘরে চলে গেলেন।

বিনয়ের রাগের ঝাঁজটা, আর কাউকে সাম্‌নে না পেয়ে, অনাথের ওপরই পর্‌ল। সামান্য ব্যাপার। সুট্‌কেস্‌টা যথাস্থানে রাখা হয়নি কেন?

বিনয় বল্‌ল, ব্যাটা সুট্‌কেস্‌টা টেবিলের ওপর রাখ্‌তে পারিস্‌নি? তোকে বিক্রী ক'র্‌লেও ওরকম আর একটী হবে না।

কথাগুলো এমন জোরে বেরুচ্ছিল, যে, নীলিমা, তার ঘর হ'তে শুনে চম্‌কে উঠ্‌ল। বিছানা ছেড়ে বিনয়ের ঘরে এল। নিজেই টেবিলের উপর সুট্‌কেস্‌টা রেখে বল্‌ল, নূতন লোক বুঝতে পারেনি। যাক্—ওর হ'য়ে, আমি ক্ষমা চাচ্ছি—আপনার আর কিছু লাগ্‌বে?

No thanks বলে, বিনয় মুখ ফিরিয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল। নীলিমা ঘরের আলোটা কমিয়ে দিল। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, অনাথকে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপার বিশেষ কিছুই না। তবুও সে রাত্রে নীলিমা ও উমেশবাবু দু'জনেই, কেবল ঘুমাবার চেষ্টা ক'র্‌লেন। ঘুম এলো না। যে-আশঙ্কা তারা করেছিলেন, তা ঘট্‌ল অতি প্রত্যুষে।

অনাথ নীলিমাকে এসে বল্‌ল, মা! আমার একবার কয়েকদিনের জন্য দেশে যেতে হবে—চিঠি এসেছে—আমার আজকেই যেতে হবে।

উমেশবাবুও এ আশঙ্কাই করছিলেন। কাজেই নীলিমা যখন স্বামীর দিকে তাকাল, উমেশবাবু কোন কথা না বলে অন্য কাজে মন দিলেন।

নীলিমার মুখ দিয়েও অনেকক্ষণ কথা বেরুল না। পরে বল্‌লেন, তবে তোমার পাওনা হিসেব ক'রে নিয়ে যাও।

অনাথ বল্‌ল, আমায় এখন চারটে টাকা দিলেই চল্‌বে।

সে কি কথা—তোমার যা পাওনা সব নিয়ে যাও। দেশে গেলেও ত খরচ লাগ্‌বে।

না মা, আমাকে শুধু চার্‌টে টাকা দিলেই চ'ল্‌বে।

নেহাৎ যা প্রয়োজন তার বেশী অনাথ নিতে চায় না। বাসার চাকরের মতো পাওনা, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে, সে কি ক'রে নেবে? এটা যে সম্ভব নয়, নীলিমা বুঝতে পারল। বিপদে প'ড়ে মানুষ, যে কোন ছোট কাজই ক'রতে পারে—কিন্তু তাকে মেনে নিতে পারে না।

অনাথের অবস্থাও তাই। বহুবর্ষের, বহুপুরুষের, যে মার্জ্জিত রুচি, ধমনীতে প্রবাহমান রয়েছে, তাকে দুর্দ্দিনে, কি ক'রে বিসর্জ্জন দেবে?

নীলিমা বাক্য ব্যয় না ক'রে অনাথের প্রাপ্য টাকা তার হাতে দিল।

তারপর অনাথ নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল। সেই পুটলিটা কাঁধে ক'রে। যে-পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে, আবার যাত্রা সুরু ক'রল।

(৬)

সাহেবগঞ্জে কয়েকঘর বাঙ্গালী বেশ মিলেমিশে আছেন। অধিকাংশ ভদ্রলোকই রেলওয়ের কর্ম্মচারী। দুই চার ঘর ব্যবসায়ী আর বাকী সব অবসর প্রাপ্ত সরকারী বড়ো চাকুরে। অবসর প্রাপ্তদের ভীড়ই বেশী। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য রক্ষা ক'রে বাকী জীবনের পরমায়ুর কটা-দিন বাড়িয়ে নেয়া। তাদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত খামার আছে। বাঙ্গালীরা প্রায় সবাই একপাড়াই আছেন।

পূজোর সময় বাঙ্গালী পাড়ায়, এবার খুব ধুম পড়ে গেছে। সবাই মিলে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব ক'র্‌ছে। রেলওয়ে কোয়াটারের সংলগ্ন প্রকাণ্ড মাঠটার মাঝখানে, পূজোর মণ্টব করা হয়েছে। মণ্টবের সাম্‌নে বড়ো সাহেবানা খাটানো হয়েছে।

সেদিন অষ্টমীপূজো। বাবুদের গিন্নীরা নানা রংএর সাড়ীতে সেজে পূজোর প্রাঙ্গনে ভীর করেছে। প্রায় সবার সঙ্গেই ছোট বড়ো ছেলেমেয়ে। তারাও রং বেরঙ্গের সাড়ী পরে, এদিক ওদিক ঘুরে বেরাচ্ছে।

দলে দলে সাওতাল নর ও নারীরা ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছে। তারাও মায়ের আগমনে আনন্দিত। অবস্থা অনুযায়ী, তারাও বেশ ভূষার কোন কার্পণ্য ক'রেনি। নিমন্ত্রিত হ'লেও তাদের চাল চলতি তে স্বাচ্ছন্দ নেই।

বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও আছেন। বৃদ্ধদের মধ্যে শশধর বাবুকেই চোখে পড়ে। শশধরবাবুর বয়স সওরের কাছা কাছি। তিনি তার বিপুল দেহভার একটা ইজিচেয়ারে ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন। মাঝে মাঝে কর্ম্মীদের

সঙ্গে দুটো একটা কথা ব'ল্‌ছেন। সর্ব্বত্র একটা কর্ম্মব্যস্ততা বিরাজ করছে। কিন্তু এতো লোকের মধ্যে চোখ পড়ে অরুন্ধতীকে—কর্ম্মকর্ত্তা আর কর্ত্তীদের মধ্যে প্রধানা ব'লে নয়। তার চেহারায় এমন একটী স্নিগ্ধ কমনীয় ভাব আছে যা কারো চোখই এড়ায় না। অথচ বিশেষ সুন্দরী বলা চলে না। পরিধানে একটী অতি সাধারণ সাড়ী। কথাবার্ত্তায় বেশ হাসি খুসি। বয়স ত্রিশ পেড়িয়ে গেছে কি না বলা যায় না। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

পুরোহিত পূজোয় ব'সেছেন। ধূপের গন্ধ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকের একটানা শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেবার যোগার।

এমন সময় প্রশ্ন উঠ্‌ল, পূজো সাঙ্গ হবার আগে দূর দেশ হ'তে আগত সাওতালদের কচি কচি ছেলে মেয়েদের খাবার দেওয়া যায় কিনা—ওরা ক্ষুধায় চেচাচ্ছে। পূজোর আগে কি ক'রে ওদের খাবার দেওয়া যায়—এই হ'ল সমস্যা।

এ সমস্যার সমাধান ক'রে দিল অরুন্ধতী এসে। সে শশধর বাবুকে বল্‌ল, ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ আর মুরি আছে, ওরা এখন ওই-থাক্‌। ওরা ত অনেকে প্রসাদ আর খেতে পারবে না।

শশধর বাবু বল্‌লেন, সে-কি কথা! মায়ের পূজোর আগে, সে কি-ক'রে সম্ভব?

মা যেমন ছোট ছেলেকে, তার ভুল হাসিমুখে বুঝিয়ে দেয়, সেই রকম হেসে অরুন্ধতী বল্‌ল, কাকাবাবু, শাস্ত্রেই বলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কোন নিয়ম নেই।

সন্তুষ্ট চিত্তে শশধর বাবু বল্‌লেন, বাঁচালে মা—বাঁচালে। ছেলেমেয়েরা যা চেঁচামিচি আরম্ভ ক'রেছিল—আমি ত ভেবেই মরছিলাম। তা বেশ—তা বেশ।

অরুন্ধতী চ'লে যাচ্ছিল। শশধর বাবু আবার বল্‌লেন, সাওতালদের খাবারের কি ব্যবস্থা ক'রেছ মা ?

অরুন্ধতী হঠাৎ প্রশ্নটা ধ'রতে পারে নি। তাই বল্‌ল, কেন ?

কিন্তু মুহূর্ত্তে প্রশ্নের ভাব বুঝে বল্‌ল, তারা পূজো হ'লে প্রসাদ পাবে ; পরে আমরা যা খাই তাই খাবে—খিচুড়ি মাংস।

কিন্তু কুলোবে তো ?

আশা করি কম পড়বে না। না হয় আবার রান্না করে নেওয়া যাবে। কতক্ষণ আর লাগবে !

তা বেশ—তা বেশ। তুমি যখন আছ, ব্যবস্থা একটা হ'বেই সে আমি জানি। তবে বুড়োবয়সে—বুঝ্‌লেনা মা, একটু ঘাবড়িয়ে যাই। তাই তোমায় জিজ্ঞেস করি। বুঝ্‌লে কিনা—

অরুন্ধতী মুখ নিচু ক'রে বল্‌ল, সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না কাকাবাবু। এখন আমি যাই ; দেখি ভাঁড়ারের কি হ'ল।

হ্যা ! মা—তুমি ওদিকেই যাও। তুমি—যেদিকে নজর দেবে না, সেদিকেই ত্রুটী থেকে যাবে, তুমি মা এখন যাও—

অরুন্ধতী চ'লে গেল।

সব বেশ চলেছে। হঠাৎ আনন্দ মুখরীত প্রাঙ্গনে গোলমাল আরম্ভ হ'লো। তুমুল তর্ক, পরে আরও কিছু হবার যোগার। বিষয়টা বলিদান প্রথা নিয়ে। বলিদেওয়া ন্যায় না অন্যায় ?

এ প্রশ্নেরও মিমাংসার জন্য ডাক পড়ল অরুন্ধতীর। অরুন্ধতী গিয়ে দেখে—শশধরবাবুকে ঘিরে, বুড়োরা ও যুবকরা-সবাই বক্তৃতার ভঙ্গীতে তুমুল তর্ক আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। শশধর বাবু বলিদান প্রথার স্বপক্ষে। তাই তার দল ভাড়ী। অপর দিকে জন কয়েক যুবক।

শশধর বাবুর পক্ষে প্রধান বক্তা ছিল—সমরেন্দ্র। অরুন্ধতীর

ওপর তার বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অরুন্ধতীর উপস্থিতে সমরেন্দ্রের উৎসাহ বেড়ে গেল।

সে রক্তৃতার সুরে বল্‌ল, আচ্ছা গুরুমা, এটা আপনি আশাকরি নিশ্চয়ই জানেন যে, যে মনিষীরা ভারতের সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, তারাই করেছিলেন পূজোপার্ব্বন—যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থা। এই পূজোপার্ব্বনের মধ্যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেইত, আজও অক্ষুন্ন রয়েছে—ভারতের সত্যতা। এর ভেতরে তারা দেখতে পেয়েছিলেন সভ্যতার কল্যান। তাদের বিধানে, সত্যিকারের কল্যান রয়েছে বলেই তো আমরা এখনও টিঁকে আছি। কাজেই তাদের প্রবর্ত্তিত ক্রিয়া কর্ম্ম আমাদের মান্‌তেই হবে।

সমরেন্দ্রের মুখ হ'তে কথাগুলো বের হ'লো প্রাণের আবেগ নিয়ে। বলার মধ্যে ছিল বিশ্বাসের জোর। সবাইকে বিচলিত কর্‌ল—এমন কি তার বিপক্ষ দলকেও।

সভাপ্রাঙ্গন নিস্তব্ধ। সবাই চেয়ে আছে অরুন্ধতীর দিকে—সে কি-বলে।

অরুন্ধতী বল্‌ল, সমরেন্দ্রবাবু! অনুষ্ঠান আর প্রথা ভিন্ন জিনিষ। অনুষ্ঠানকে বড়ো করে দেখ্‌লে, প্রথার অবমাননা করা হয়। প্রথাকে রাখ্‌তে হ'লে, অনুষ্ঠানের অন্তরালে, যে-সত্য লুকোন রয়েছে—সেটার খবর নেবেন না?

সমরেন্দ্র চুপ করে গেল। কিন্তু জবাব দিল মণীন্দ্র। সে প্রথমে বলিদানের বিপক্ষে ছিল।

মণীন্দ্র বল্‌ল, আর যাই হোক—সহস্র সহস্র বৎসরের বিপর্য্যয়ে যা টিঁকে আছে —যা আজপর্য্যন্ত আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

সত্যের সন্ধানে, তাকে অস্বীকার ক'রবার কি উপায় আছে? কাজেই মানতেই হবে, যে বলিদানের একটী অর্থ রয়েছে--তাকে অবহেলা করা চলে না কিছুতেই।

অরুন্ধতী বল্‌ল, চোখ থাকতে চোখের অপব্যবহার করলে খানায় পড়বার ভয় থাকে মণীন্দ্র বাবু। এ অন্ধবিশ্বাস—

অরুন্ধতীর মন্তব্য কারোই পছন্দ হ'লো না।

হীরেন্দ্র বল্‌ল, হোক্ অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাসই যদি এতোকাল হিন্দুকে রক্ষা ক'রে থাকে, তবে কেন তাকে মান্‌বো না? অশ্রদ্ধা করে উড়িয়ে দিয়ে কি লাভ?

অরুন্ধতীর বল্‌ল, সূর্য্যোদয়ের সময় পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখ্‌লে প্রশ্নের মিমাংসা হয় না। লাভ-ক্ষতি তখনই প্রতীয়মান হয়।

বহুশতাব্দী যে ভাবধারা, মানব চরিত্রে প্রবাহমাণ তাকে সহজে রূদ্ধ করা যায় হয় না। আঘাত খেয়ে চোখে ঘোর লাগে, কিন্তু পরক্ষনেই সাম্‌লে নেয়! ফল্গুধারা, প্রস্তর খণ্ডের ওপর শুধু শেওলা জমাতে পারে। অবিশ্রান্ত প্রবলবর্ষন শুধু পারে সে—আবর্জ্জনা দূর কর্‌তে। প্রস্তরের ক্ষমতা নেই—সে আবর্জ্জনা রাশী দূর ক'রে নেয়।

তাই অরুন্ধতীর কথাগুলো সমরেন্দ্র বুঝ্‌তে পারল না। সে চটে গিয়ে বল্‌ল, আপনি কি বলতে চান—যে বলিদানের কোনই প্রয়োজন নেই? যে মনিষীরা এ বিধান দিয়েছেন, তাদের কি কোন বিচার বুদ্ধি ছিল না?

অরুন্ধতী স্বাভাবিক ভাবে বল্‌ল, এ সামান্য ব্যাপারে ভারতের মনিষীদের টেনে না আনলেও চলতে পারে। আমার কথা হোচ্ছে যে, সত্যিকারের বিষয় বস্তু চাঁপা দিয়ে--তার অনুষ্ঠানকে ফেনিয়ে

ফেনিয়ে বাঁড়িয়ে তুল্‌লে, কাম্য যা তা তলিয়ে যায়। তাঁকে আর খুঁজেও পাওয়া যায় না।

মণীন্দ্র বেজায় চটে গিয়ে বল্‌ল, অল্প বিদ্যেয় মেয়েরা যে কি ভীষণ হ'তে পারে—আপনি তার একটী দৃষ্টান্ত।

মণীন্দ্রের কথা সমর্থন ক'রে হীরেন্দ্র বল্‌ল, সব দেশে পূজনীয়রা যে-বিধান দিয়ে-গেছেন, তাদের ওপর অমন অশ্রদ্ধা! আপনার স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

অরুন্ধতী হেসে বলল, স্পর্দ্ধা আমি করছিনে বা আমি কা'কেও অশ্রদ্ধা জানাচ্ছিনে। আমার কথা হোচ্ছে—একদিন ধর্ম্মের যে-বিধান ছিল—যে অনুষ্ঠান ছিল—সে-টাই যে হবে চরমসত্য—এ হ'তেই পারে না। যুগ যুগ ধ'রে যে ধর্ম্মের এক-ই ধ্বজা আমাদের বয়ে চল্‌তে হবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে এ কথার প্রমান আছে। য়ুরোপে, সমাজের বুকে, যেসময় পোপের আধিপত্য ছিল—সে সময় পোপের বাণী সবাই মেনে নিয়ে ছিল। সেদিন কেউ প্রশ্নও করেনি পোপের উদ্দেশ্য কি? সেদিনকার সমস্ত মিথ্যা আর ব্যভিচার অম্লান বদনে সত্য ব'লে মেনে নিয়েছিল—য়ুরোপের জন সাধারণ। কিন্তু একদিন য়ুরোপের সেই তিমির রাত্রির অবসান হোল—বিদ্রোহ কর্‌ল একদল—ভাঙ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল পোপ-চালিত খৃষ্টধর্ম্ম—নবআলোকে য়ুরোপ উদ্ভাসিত হ'য়ে জগতের সাম্‌নে দিল তার নূতন পরিচয়। আপনি কি বল্‌তে চান—প্রটেষ্ট্যাণ্টরা অসত্যকে ভিত্তি ক'রে, নবযুগের প্রবর্ত্তন কর্‌তে পেরেছিলেন?

হীরেন্দ্র ইতিহাসে এম, এ পর্য্যন্ত পড়েছে। কাজেই এ প্রশ্নতে সে আর স্থির থাকতে পারল না। বল্‌ল, কিন্তু ইংলেণ্ড্‌ যে, প্রটেষ্ট্যাণ্ট্‌ মত গ্রহণ কর্‌ল—তার মধ্যে কোন সত্য আছে?

অষ্টমহেন্‌রির রূপবিলাসের লালসা ও কামোন্মাদনা সত্য-রূপ নিয়ে আস্‌বে—সেকথা আজ এই প্রথম আপনার মুখ হ'তেই শুন্‌লাম।

একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে মণীন্দ্র বল্‌ল, ভাঙ্গাটা অতি সহজ—কিন্তু গড়াটা কঠিন। কাঁচের গ্লাস একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না।

অরুন্ধতী বল্‌ল, আপনার এ উপমাটা এ স্থলে খাটেনা।

কিন্তু এটা মানেনতো যে, সমাজের বিধান মেনে নিতেই হবে—কেউ ভাঙতে পারবেনা। ভাঙতে চেষ্টা করলে নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেবে মাত্র। সমাজের বুকে আঘাত করার মধ্যে রয়েছে মাদকতা।

এ কথা শুনে অরুন্ধতী অপ্রস্তুত হ'লো। বল্‌ল, উচ্ছৃঙ্খলতা ব'লে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

হীরেন্দ্র বল্‌ল, আমাদের প্রাচীন অনুষ্ঠানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবকেই আমি বলি উচ্ছৃঙ্খলতা—বলি—

আমি বলি ভাবের রাজ্যে প্রকৃতিকে চাঁপা দেবার চেষ্টা হলো আপনার প্রয়াস। ভুলে যাবেন না, যে কারনে ইংলেণ্ড্ একদিন প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ মতাবলম্বী হয়েছিল—সেটা উচ্ছৃঙ্খলতার অভিব্যক্তি। তাই যদি হোত, তবে পিউরিটানরা সেদিন দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে যেতোনা। তারা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চ'লে গেল—নিজেদের আদর্শকে সাম্‌নে রেখে। সত্য অনুভূতির প্রেরণার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল—আর সব চিন্তাভাবনা—তুচ্ছ হয়ে গেল জীবন-সংগ্রামের দুশ্চিন্তা। তাদেরই বংশধররা আজকে সভ্যজগতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে সভ্যজগতে আমেরিকার দান কম নয়। নানাদিকে তারা সভ্যজগতের সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে। তাদের এ-দানের উৎস প্রবাহমান সেদিনকার সত্যসন্ধানীদের মধ্যে। সেই গৃহত্যাগীরদল—তাঁরা যে প্রেরণা দিয়ে

গেছেন, তা আজও বেচে আছে—তাই দিন দিন আমেরিকার মাটিতে ফল্‌ছে সভ্যতার উপাদেয় ফল। একদিন সমস্ত য়ুরোপ তার নিকট হ'তে টাকা ধার নিয়েছিল। আজও শোধ দিতে পারে নি। এখনও পেলে নেবে।

সমরেন্দ্র সমস্ত তর্ক বিতর্ক মনযোগ দিয়ে শুন্‌ছিল—বল্‌ল, কিন্তু বিদেশের মতবাদ আমাদের দেশে প্রয়োগ কর্‌লে—ভারতের বৈশিষ্ট যে নষ্ট হয়ে যাবে—তার প্রতিকার কি ?

অরুন্ধতী বল্‌ল, সত্যটা Flexible। ওকে মাপ কাঁঠীর মধ্যে ফেলে মাপা যে যায় না। কিন্তু যা-সত্য—তা সমস্তদেশে এবং সর্ব্বকালের জন্য সত্য। কি করবেন আপনি বৈশিষ্ট নিযে—যদি না থাকে তাতে আত্মবিকাশের পথ। তার চাইতে সত্যিকারের পথে এগিয়েগিয়ে—যদি পাওয়া যায় বিশ্বের দরবারে প্রবেশিধাকারের ছারপত্র—তাতে লাভ নয় কি ?

অরুন্ধতী একটু এগিয়ে, একটা চেয়ারের হাতলে হাত রেখে আবার বল্‌ল, তা ছাড়া শাসন নীতির ভেতর দিয়ে, সত্যিককারের বাঁচবার পথ কোথায় ? য়ুরোপ এটা সম্যক উপলব্ধি করেছে। এজন্য তার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মায়াজাল এতো সহজে টুটে গেছে। তার জীবনের সমস্ত সত্তায় রয়েছে এক বিরাট ক্ষুধা—যে ক্ষুধা থেকে উদ্ভব হয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে ভর ক'রে তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যেতে চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু আমরা এপারে ও নই ওপারেও নই। তাদের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে—চোখে আমাদের বিস্ময় লাগে এবং বাহবা দিয়েই আমরা ক্ষান্ত। আমরা এতই অকেজো।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও অরুন্ধতী ভাব্‌তে পারে নি—তার কথার ধারা

কোথায় শেষ হ'বে। কথার আবেগে অরুন্ধতীর চোখ মুখ দিয়ে এক অনির্ব্বচনীর দীপ্তি এল।

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বর্ষনের পর, তরুন প্রভাতে অরুণ, মেঘের আড়াল হ'তে মাঝে মাঝে দেখা দেয়, আবার মেঘের পেছনে চ'লে যায়—পূর্ণ বিকসিত হবার পূর্ব্বে পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়ে যায়—যে সে-ই চিরদিনের সত্য। মানুষ ও তাকে অস্বীকার কর্'তে পারে না। তাকে কায়-মনে প্রার্থনা করে—তার প্রথম স্পর্শে সঞ্চারিত হোয়ে উঠ্'তে চায়।

অরুন্ধতীর কথা শুনে উপস্থিত শ্রোতারা কি যেন হাতরাতে চাইল। কিন্তু অল্পক্ষনের জন্য—আবার তারা স্বস্থানে ফিরে এল।

হীরেন্দ্র বল্‌ল, কিন্তু বলিদান বাতিল করা চলবে না। অনর্থক অমঙ্গল টেনে এনে লাভ কি? সবারই ঘরে ছেলে মেয়ে আছে।

বৃদ্ধ অনুকুলবাবু বল্‌লেন, মাকে মানত করা হয়েছে এখন আর কোন প্রকারেই বলি রদ্ করা যাবে না।

প্রসঙ্গটা বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ চল্‌ত। পুরোহিতের নির্দ্দেশ এল—বলির আয়োজনের জন্য। উৎসবের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে আবার সবাই মিশে গেল। কল কোলাহল মুখরিত উৎসব প্রাঙ্গন আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষন আগে তর্কজালে পরস্পরের মধ্যে যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছিল তা, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল; যেন ক্ষরপ্রবাহ কোথায়ও আটকে ছিল, এখন বাধ ভেঙ্গে আবার ছুটে চলেছে।

সমরেন্দ্র এসে অরুন্ধতীকে বল্‌ল, গুরুমা আমি বলি দেব;—আমার এতে খুব উৎসাহ আছে।

অরুন্ধতী আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল, সে কি! কিন্তু আপনার স্ত্রীর যদি আপত্তি থাকে?

আপনি অনুমতি দিলে তার কোন অমত থাকবেনা এ আমি নিশ্চয় ক'রে বলে দিতে পারি।

মানুষের ওপর মানুষের এই যে বিশ্বাস, এটাই মানব সভ্যতার প্রাণপ্রবাহ এবং প্রত্যেক মানুষের কাম্য। সে-বিশ্বাসের মূলে থাকে জনসাধারণের প্রতি মঙ্গলাকাঙ্খা। মঙ্গলাকাঙ্খার তারতম্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা সৃষ্ট হয় এবং লেগে যায় দ্বন্দ। সে-দ্বন্দের সমাধান হয় কর্ম্মক্ষেত্রে। সেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঞ্ছা একটা জাতিকে বহুউর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে। আবার পঙ্কিল গহ্বরে ফেলে দিতেও পারে।

অরুন্ধতী সমরেন্দ্রের প্রস্তাবে মত দিয়ে রন্ধন-শালায় যাচ্ছিল। হীরেন্দ্র এসে বল্‌ল, গুরুমা, আমার এখন ষ্টেশনে যেতে হবে। আমার এক বন্ধু এ ট্রেনে আস্‌ছেন।'

সুখবর বল্‌তে হ'বে। এমন দিনে বন্ধু আস্‌ছেন! আমাদের ভাগ্য ভাল বল্‌তে হবে। তাকেও এখানে নিয়ে আসবেন। বাঙ্গালী হয়ে নিশ্চয় তিনি আমাদের এ উৎসবে যোগ দেবেন।

হীরেন্দ্র একটু চিন্তিত হ'ল। তারপর বল্‌ল, বোধ হয় রাজী হবে না। আচ্ছা আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।

হীরেন্দ্র চ'লে গেল।

বলিদান আসন্ন। সমস্ত প্রাঙ্গন অজস্র ঢোলের কাড়ানাকাড়ার সঙ্গে আলোড়িত হয়ে উঠল। কূলবধুরা মণ্ডপের পাসে দাঁড়িয়ে মায়ের নিকট কামনা ক'র্‌ছে। ছেলেমেয়েরা ভীর ক'রে বলির স্থানে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ জানতে চায় না বা কেউ বলে দেয় না এর তাৎপর্য্য কোথায়। আবাহমানকাল হ'তে চলে আস্‌ছে, তাই শিকরজালে এটা এতো শক্ত হয়ে বসেছে যে, হঠাৎ

কেউ ঠেলে ফেলে দিতে পারবে না। সারাজীবন হাতরালেও মানুষ কোন কূল পাবেনা।

প্রায় এক ঘণ্টার পর হীরেন বন্ধুকে নিয়ে হাজির হোল। পূজো হ'য়ে গেছে, এখন প্রসাদ বিতরন হচ্ছে। হীরেন বন্ধুকে শশধরবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্‌ল, আমার স্কুলের বন্ধু অনাথ।

শশধরবাবু কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌লেন, আজকে আপনি আমাদের অতিথি; আজকে এখানেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

এমন সময় অরুন্ধতী কি একটা কাজ নিয়ে শশধরবাবুর নিকট এসে হাজির। শশধরবাবু অরুন্ধতীকে দেখে বল্‌লেন, ইনি হীরেনের বন্ধু; আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবেন।

অরুন্ধতী কোন উত্তর দেবার আগেই অনাথ বল্‌ল, পার্‌লে আমিও সুখী হোতাম কিন্তু আমার এখনই যে কাজে যেতে হবে, কখন ফিরি ঠিক নেই।

শশধরবাবু বল্‌লেন, বেশত! আপনি কাজ শেষ করে আসুন; আপনাকে সহজে ছাড়ছিনে।

অনাথ তখন অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল। পরে বল্‌ল, আমি এখন যাই।

শশধরবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কি-হয়; প্রসাদ নিয়ে যান, মায়ের প্রসাদ।

অগত্যা অনাথকে বস্‌তে হোল। অরুন্ধতী প্রসাদ পাঠিয়ে দিল।

প্রসাদ নিয়ে অনাথ ত্রস্ত চলেছিল, পথে দেখা হোল অরুন্ধতীর সঙ্গে।

অরুন্ধতী বল্‌ল, খাবার হ'তে এখনও দেরী আছে। তুমি কাজ শেষ করে অবশ্য আসবে। তোমার জন্য সবাই বসে থাকবেন।

(৭)

শশধরবাবু অবসরপ্রাপ্ত জজ, বিপত্নীক। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো নির্জ্জন স্বাস্থ্যনিবাসে কাটিয়ে দেবার জন্য এখানে বাড়ী ক'রেছেন। কয়েকজন পুরোনো চাকর ছাড়া তাঁর সংসারে আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে অরুন্ধতী এসে—বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ জীবনে শান্তি দিয়ে যায়। কন্যাসম অরুন্ধতীর সঙ্গে নানাবিষয়ের আলাপ আলোচনায় জীবনের একঘেয়েমি ভুলে থাকেন। সম্প্রতি তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের চর্চ্চা ক'রছেন। বাড়ীর সম্মুখভাগে একটা প্রকাণ্ড বাগান ক'রেছেন। এ নিয়েই তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

আজ ৺বিজয়াদশমী উপলক্ষে পাড়ার কয়েক ভদ্রলোক নেমন্ত্রিত হ'য়েছেন—সন্ধ্যার পর খাওয়া। অরুন্ধতী দুপুরে এসেই সমস্ত আয়োজন ক'রছে। একে একে সবাই আস্‌ছেন। বন্ধুদের মধ্যে রাখালবাবু, মতিবাবু ও অনুকুলবাবু এসেছেন। পরে এল সমরেন্দ্র, মণীন্দ্র ও কালু। কেবল তখন পর্য্যন্ত এলোনা হীরেন্দ্র ও অনাথ। কাজেই তাঁদের জন্য সবারই অপেক্ষায় থাক্‌তে হ'বে। শশধরবাবু সবাইকে তাঁর বস্‌বার ঘরে নিয়ে গেলেন। সবাই বস্‌লে, তিনি নিজের দেহের অসুস্থতার জন্য, একটা ইজিচেয়ারে আরাম ক'রে বস্‌লেন।

একটু রসিকতা ক'রবার চেষ্টা ক'রে, শশধরবাবু বল্‌লেন, নিজের বাড়ীতে নিজেই সভাপতি হ'য়ে বসেছি বলে—হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

সবাই সে হাসিতে যোগ দিল।

অরুন্ধতী মৃদু হেসে বল্‌ল, সভাপতিত্বের মোহ আমাদের দেশে কেউ কাঁটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। দেশের সর্ব্বত্র, কর্ম্মপ্রচেষ্টায় চিরকালই সভাপতির আসন—বেশ জাঁকাল রকমে পাতা হয়েছে। আজও সেই সভাপতিত্বের মোহ ঘোচেনি—গলাবাজিও ঘোচেনি—বুচেছে শুধু কর্ম্মানুরাগ—বেড়েছে শুধু আস্ফালন—যার কাণাকড়িও দাম নেই। আর আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সভাপতির আসনে ব'সে প্রাচীনরা—যে-যা বলেছেন—আমরা গোগ্রাসে সব গিলেচি—মাঝে মাঝে ক্ষেত্রানুসারে উদ্গার করেছি।

একটু পরে অরুন্ধতী আবার ব'ল্‌ল, আমরা বুঝতে চাইনে যে, বিগতদিনের দর্শন দিয়ে বর্ত্তমানের সমস্যার সমাধান করা যায়।

অনুকুলবাবু ভূতপূর্ব্ব দর্শনের অধ্যাপক। তিনি চটে গিয়ে বল্‌লেন, সেদিনও তুমি এরূপ বিরুদ্ধভাবের কথা বল্‌ছিলে। এগুলো শুধু তোমাদের মুখের বুলি। যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে সমস্ত বিষয়ে কথা বলা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু-ই নয়।

অরুন্ধতী কোন উত্তর দিল না। সে উঠে গিয়ে তার সেলাইটা উদ্ধার ক'রে আবার স্বস্থানে বস্‌ল। সবার মনেই একটু অস্বস্তিভাব পরিলক্ষিত হ'ল। কিন্তু অনুকুলবাবুর কথা বোল্‌বার ভঙ্গীর পর কেহ আর হঠাৎ কিছু বল্‌তে পার্‌লে না।

কিছুক্ষণ পর শশধরবাবু বল্‌লেন, অপ্রাপ্তবয়স্কেরা পাছে কোন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়, সে-জন্য সর্ব্ব অনুষ্ঠানে প্রাচীন লোকদেরই আদর হয়। তারা বহু অঙ্ক খতিয়ে, পাঁকা হিসেবীর মতই বিধানে আশ্রয় নেন। তাদের বিধানে কোন ফাঁক থাক্‌তে পারে না।

রাখালবাবু শশধরবাবুর কথার সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌লেন, আজও

আমাদের প্রাচীন তত্ত্বের মূল্য জগতের নিকট আছে। তারা যে ইমারত গড়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও মজবুত আছে।

শশধরবাবু আবার বল্‌লেন, দেখো অরুন্ধতী, পূর্ব্বপুরুষরা যে বিধান দিয়ে গেছেন—সেটা অনভিজ্ঞ যৌবনের পাগলামি নয়। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন—তা বহুদর্শী বনেদির হিসেব—সেখানে কোন গরমিল নেই। ভারতের মনীষীরা যে দর্শন স্থাপন ক'রে গেছেন—সেটাই ভারতের প্রাণ—এই নিয়েই তাকে বাঁচতে হ'বে—চিরকাল—যুগ যুগ ধ'রে। এতে আছে শান্তি আর পশ্চিমের দর্শনে আছে শুধু ক্ষুধা—সে ক্ষুধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাতে শান্তিও ঘোঁচে—স্বস্তিও নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যই ভারতের প্রাচীন তত্ত্বের এত মূল্য বেশী—মূল্য নেই অস্বীকার করা যায় না।

অরুন্ধতী বল্‌ল, প্রয়োগ ও প্রয়োজনের পরম্পরায় যদি বিচার করা যায়, তবে বল্‌তে হ'বে প্রাচীন তত্ত্বের আজকের দিনে, কোন মূল্য নেই।

মতিবাবু হতাস হ'য়ে বল্‌লেন, মূল্য—নেই!

অরুন্ধতী বল্‌ল, সেদিন হয়ত তার মূল্য ছিল—সেদিন হয়ত তার আদর ছিল—তাই ব'লে যে সেটা চিরকাল ধ'রে, পরিবর্ত্তনশীল জগতে একই স্থান অধিকার ক'রে থাক্‌বে, তা হতেই পারেনা।

অরুন্ধতীর কথা শুনে সবাই যেন আহত হ'ল। সব চুপ ক'রে গেল।

রাখালবাবু বল্‌লেন, তোমার এ মনোভাবের মধ্যে আমি ভারতের ভবিষ্যত অন্ধকার দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি জানি এ তোমাদের মোহ—এ মিথ্যে—এ ক্ষণস্থায়ী। যেদিন এ নেশার ঘোর কাঁটবে—সেদিন এ ভুলের গ্লানি সহ্য ক'র্‌তে পারবে না।

অরুন্ধতী বল্‌ল, নিরেট অট্টালিকারও ফাঁটল ধরে—তাই ব'লে মানুষ সে-টাকে ত্যাগ ক'রে যায় না। তার সংস্কারের ব্যবস্থা করে ও

রাখেই। ভুলের যে একটী গ্লানি আছে সেটা স্বীকার্য্য। কিন্তু তার প্রকোপ সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা নির্ভর করে—আপনাদের সহানুভূতির সাপেক্ষে।

সেলাই হ'তে মুখ তুলে অরুন্ধতী বল্‌ল, আমাদের অভিভাবকেরা আমাদের খেতে এবং স্কুলে পাঠিয়েই মনে ক'রলেন, তাদের দায়িত্ব শেষ হোয়ে গেল। কিন্তু মানুষ ক'র্‌তে পারেন নি। সত্যিকারের মানুষ হ'বার সুযোগ যদি—আমাদের আজ এসে থাকে—তবে কেন সে-টা অবহেলা কোরব?

শশধরবাবু বল্‌লেন, কিন্তু স্বস্তিই যদি ঘুঁচে গেল—শান্তি ও যদি নষ্ট হয়ে যায়—তখন দাঁড়াবে কিসের ওপর ভর ক'রে। তখন যে আরও বিকৃতরূপ নিয়ে তোমরা আবির্ভাব হ'বে। তখন ত আর সেই সনাতন পথে ফিরে আসা যাবে না। কোন্ আদর্শ নিয়ে তখন বেচে থাক্‌বে? সেদিনের দুঃখের কথাও একবার ভেবে দেখ দেখি?

মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাবার শেষ অধ্যায় হোত, তবে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সংস্থান কোথায় এ-জগতে? গোঁজামিল দিয়েই যখন জগত চ'লে আস্‌ছে—তখন আসুক না জীবের প্রাণে দুঃখ—তবুও ত মনুষ্যত্ব বিকাসের পথ খোলা রইল।

অনুকুলবাবু বল্‌লেন, অনির্দ্দিষ্ট কল্যাণের দিকে তাঁকেয়ে—যাত্রার, কোন যুক্তিই থাকে না। তার চেয়ে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণের পথেই প্রকৃত মঙ্গল ও সেই ভাল।

অরুন্ধতী সেলাই ক'র্‌তে কর্‌তে বল্‌ল, কিন্তু ভালরও ত ভাল আছে। একদিকের ক্ষতি—অন্যদিকের সঞ্চয়। সে সঞ্চয়ের মূলধন হয়ত আরও কল্যাণকর আরও মঙ্গলজনক।

অনুকূলবাবু, অরুন্ধতীর যুক্তি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারলেন না। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু পরে যা বললেন তা শশধরবাবুরই অনুকরণ। বললেন, কিন্তু যে দিন তোমাদের ভুল ধরা পরবে—সেদিনকার পরাজয়ের গ্লানি কোথায় রাখবে?

পরাজয়ের ভাবনা ভেবে জগতে চলা যায় না। আর যদি পরাজয় আসেই—সেদিনও আমাদের নির্ব্বিকার হ'য়ে চলতে হবে—সেই চিত্তের আধারের প্রকোষ্ঠ আপনাদের নিকট। আমাদের রাসায়নিক অধ্যাপক জানতেন যে, নাইট্রোগ্লিসারিন অত্যন্ত বিস্ফোরক। সামান্য উত্তাপের তারতম্যে কল্পনাতীত অঘটন ঘটে। তবু তিনি প্রত্যেকদিন তার সাহায্যে গবেষণা ক'রতেন। সে গবেষণায় তিনি এত তন্ময় হ'য়ে যেতেন যে, কোন দিকে তার খেয়ালই থাকত না। একদিন বিপদ হোল। সে-দিন সেই উত্তপ্ত তরল পদার্থ—তার খোলাটাকে চুরমার কোরে তার মুখের উপর যেয়ে পরল। তিনি সঙ্গাহীন অবস্থায় সে-খানেই প'রে গেলেন। সে-দিনের—সে পরাজয়ের গ্লানি তার অন্তরে থাকলে—আজকে তিনি তাঁর গবেষণায় কৃতকার্য্য হ'তে পারতেন কি না সন্দেহ। মারাত্মক ব'লেই কি—পরিহার্য্য?—

অরুন্ধতীর কথা শেষ না হ'তেই সবাই সমস্বরে ব'লে উঠল, আপনি সেই সঙ্গাহীন অবস্থার পরের বিবরণ-টুকু বলুন—আগে।

অরুন্ধতী বলল, তারপর তাকে ধরাধরি ক'রে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল। সেখানে তিনি, মাস খানেক ভুগে আরোগ্য হ'য়ে আবার কাজে যোগ দিলেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হোচ্ছে—দুর্ঘটনার পরও যদি তিনি তাঁহার গবেষণা ছেড়ে দিতেন—তবে আজকে কি সে তত্ত্ব জগতের সামনে উদ্ঘাটিত হোতে পারত?

অনুকূলবাবু ব'ল্‌লেন, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা—বিফলে ও ত যেতে পারত। মাঝ থেকে কয়েকদিন দুর্ভোগ।

দুর্ভোগের মধ্যেও যে আনন্দ টুকু আছে—সে রসে যারা বঞ্চিত তারা বুঝতে পারে না—কোথায় তার উৎস। আর যারা সঙ্কায় দেয় আত্মবলি, তারা নিজেদের দেয় ফাঁকি। বহু বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁরা দিনের পর দিন খেঁটে যাচ্ছেন—কর্ম্মে আলস্যি নেই—আশার বিরাম নেই। নেই বা হোলেন তাঁরা কৃতকার্য্য—কিন্তু তাই বলে কি মান্‌তে হ'বে তাঁদের পরিশ্রম নষ্ট হ'য়ে—তাঁদের জীবন বিফল হোয়ে গেল? কখনই না। নিত্য নতুন তাঁরা, নব নব আলোকের সান্নিধ্যে আস্‌চেন—জগতের বস্‌ছে নতুন আলো সম্পাত ক'র্‌চেন—নাই বা হোল তাঁদের জীবনের কাম্য লাভ। তবু তার মূল্য আছে—পরবর্ত্তী উদ্যোক্তাদের জন্যে। এ তো আর ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম নয়—যে কুড়িয়ে নেবার কোন সার্থকতা নেই? শীতের সময় য়ুরোপের অনেক স্থানে—দিবাভাগেই কুয়াসা এসে রাতের অন্ধকার নাবিয়ে দিয়ে যায়। তবে কি বল্‌তে হবে দিনের কাজ শেষ হ'য়ে গেছে—সবাইকে বাসায় ফির্‌তে হবে? ঐ কুয়াসাটাই কি হবে সত্য, আর সব মিথ্যে?

অনুকূলবাবু বল্‌লেন, কিন্তু তাঁর জীবনের শান্তি ত ঘুঁচে গেল—

এ খানেই আপনাদের মস্ত ভুল। যে শান্তির আশায় আমরা ছুটি—সে ত শান্তি নয়। সেটা মনের স্থাবিরতা—মনের জড়তা। সে স্থাবিরতা দেখা যায় গৃহপালিত পশুর মধ্যে—যারা মৃত্যুর অপার যন্ত্রণা হ'তে আরামের নিমিত্তেও—গৃহস্থের—তার গলায় লাগান দড়ি ছিঁড়ে গৃহস্থেকে লোকসানের ভাগী ক'রে যায় না। তারা সেই ছোট্ট-গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের দেয়—কালের করালগ্রাসে নিমজ্জিত। বেচারাদের মর্‌বার

সময়-ও একটু পা ছড়িয়ে মর্‌বার উপায় নেই। কিন্তু মানুষ কি তাই—মানুষের সম্মুখে রয়েছে বিরাট সমুদ্র—ঐ মহাসিন্ধুর ওপারে যাবার চেষ্টাই মানুষের ব্রত ও সেখানেই রয়েছে শান্তি।

শশধরবাবু বিহ্বল চক্ষে চেয়ে রইলেন। একটা কথাও তাঁহার মুখে এল না। অনুকুলবাবুও কথা বল্‌বার সুযোগ হাড়িয়ে ফেল্‌লেন।

কিছুক্ষণ এম্‌নিভাবে গেলে, অনুকুলবাবু কাপড়ের খোঁট দিয়ে মুখটা পুঁছে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, সনাতন দর্শনকে তুমি অবজ্ঞা কর্‌তে পারবে না। যুগ যুগান্তর ধ'রে কত লক্ষ কোটী লোক—একে স্বীকার ক'রে এসেছে ও আস্‌বে। তুমি যা বল্‌লে—ঐ পশ্চিম থেকে ধার করা কথা। এ কথা ভুলে যেওনা—পূর্ব্ব পশ্চিম কোন দিন-ই মিল্‌তে পারে—East for East—তার বৈশিষ্ট নিয়ে তা-কে চলতেই হবে। আর পশ্চিম পশ্চিমই থাক্‌বে। পশ্চিমের ভাবধারা এ দেশের বুকে বইয়ে দিলে আবর্ত্তনের সৃষ্টি হবে। তুমি যা ব'ল্‌ছ, তাতে মনে হয় প্রাচ্যের যেন কোন মূলধনই নেই—তার কাছ থেকে যেন শিক্ষনীয় কিছু-ই নেই।

অরুন্ধতী বল্‌ল, শিক্ষনীয় নেই একথা আমি বল্‌ছি না—বল্‌ছি তার সংস্কৃতির অভাব। আধুনিক সভ্যতার পরিচয়ে—সনাতন প্রথা হয়—চলার পথে অন্তরায়। ভারত যতই অতীতের আধ্যাত্মিক কথার বড়াই করুক—বাইরের ভাবধারার প্রবাহ -যদি এর পঙ্কিলতা বা বর্ত্তমানের অনাবশ্যক ব্যপার গুলোকে, অমূল পরিবর্ত্তন ক'রে দিতে না পারে—তবে এ-দেশ প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে না। সূর্য্যের সত্যিকারের রূপ দেখ্‌তে হ'লে—সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দুই-ই—দেখ্‌তে হয়।

একটুখানি থেমে বল্‌ল, East for East—এটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে—রাষ্ট্রীয় নীতি। আর সেটা-ই যদি ধ'রেন—তার মূলে আছে আপনাদের নিজেদের মতামতের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। একই-ভাব ধারা

হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যে আছে। কিন্তু সে বৃহৎ সমষ্টির ওপর-ও প্রভাব বিস্তারের জন্য—চাই নিজেদের আত্মবিকাশ—চাই নিজেদের গোড়া শক্ত। শূন্য মাঠে বক্তৃতা দেবার সার্থকতা নেই।

শশধরবাবু বল্‌লেন, কিন্তু পরিবর্ত্তনের দুর্গতির হাত হ'তে নিষ্কৃতির কি উপায় আছে? ভবিষ্যত যে, আরও অন্ধকার হবে না ও দুঃখের মাপ কাঁঠী যে বেড়েই চল্‌বে না—তাতেও তো কোন নিশ্চয়েতা নেই।

অরুন্ধতী একটু হেসে বল্‌ল, কাকাবাবু—এ হোল—মেঘ দেখে ঝড় ওঠ্‌বার আগেই নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে, ঝড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার বৃথা চেষ্টা। দুঃখ যে থাক্‌বে না—এর কোন স্থিরতা নেই।—

কিন্তু দুঃখ নিয়ে ফের্‌বার চেয়ে—যেমন-টী আছি, সে-ই থাকাটা কি কি ভাল নয়? তাতে কোন লাভ ক্ষতির বালাই নেই। কিন্তু দুঃখ নিয়ে ফের্‌বার পরাজয়ের গ্লানি কে রুখ্‌বে?

পরাজয়ের গ্লানি সাম্‌লাতে পারবেন না, ব'লে কি দুঃখের বোঝা আরও চাপিয়ে যাবেন? আমি বলি—দুঃখ যদি আসেই—সেদিনের সংশোধনের পথ যেন উন্মুক্ত থাকে। সে পথ যত প্রশস্ত থাক্‌বে—জাতির উন্নতির দিক্ হ'তে, ততই মঙ্গলজনক হবে। ঝড় যদি ওঠেই, তার সমস্ত তাণ্ডবলীলা অবিচলিত চিত্তে সহ্য ক'রবার ক্ষমতা যেন থাকে। ঝড়ের পর একবার ত', আকাশ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হোয়ে উঠবে। সে-ই আশায় আমাদের পথ বেয়ে যেতে হবে।

শশধরবাবু চুপ ক'রে রইলেন। জবাব দিতে বাঁধল। কিন্তু স্বীকার কর্‌তেও ঢের বেশী বাঁধল। বহুক্ষণ পরে বল্‌লেন, এ শুধু তোমার অনুমান—

অরুন্ধতী বল্‌ল, জগতে সমস্ত কিছু চল্‌ছে—শুধু অনুমানের ওপর

নির্ভর ক'রে। জ্যামিতির আঁক ক'সে জীবনের ক'টা কাজ করা চলে? নীলের ব্যবসা ছিল—ভারতবাসীর একচেটিয়া। কিন্তু এখন চ'লে গেছে জার্ম্মানীর রাসায়নিক দ্রব্যাগারে—এখনকার দিনে রংয়ের ব্যবসায় তার সমপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। কিন্তু এই যে এ-টা রাসায়নিক দ্রব্যাগারে প্রবেশাধিকার পাবে—এটাও ত শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি নিয়ে-ই হ'য়েছিল।

মতিবাবু এতক্ষণ চুপ্ করেই ছিলেন। কোন কথার ভালমন্দ প্রকাশ করেন নি। এখন আর তিনি ধৈর্য্য রাখ্তে পার্লেন না, বল্লেন, দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের মঙ্গল চিন্তা ক'র্বার ভার—এতোকাল ধ'রে ন্যাস্ত হ'য়ে এসেছে—দেশের দূরদর্শী, চিন্তাশীল প্রবীণদের হাতে। এতোকাল যদি সেই আওতায়—দেশ বেঁচে এসেছে—কল্যাণের মধ্যে দিয়ে—তবে আজকেও তাদের-ই বিধানেব ওপর বিশ্বাস্ রেখে চল্তে হবে।

মতিবাবু তার মন্তব্য প্রকাশ ক'রে পরম পরিতৃপ্তিতে একটা নিশ্বাস ফেলে অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু অরুন্ধতী চুপ ক'রে সেলাই ক'রে যেতে লাগ্ল! নীরব থেকেই বুঝিয়ে দিল—আলচ্য বিষয়ে—বেশী কিছু বলা—শুধু পণ্ডশ্রম। এদের চিরকাল কেটেছে নিরবচ্ছিন্ন সুপ্তির নেশায়। এরা না পারে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যেতে—না পারে ফির্তে—এদের মনের গভীর অন্তরে—সেই সনাতন আধ্যাত্মিক পক্ষে হয়-ত সত্যের প্রতি একটা সত্যকার নিষ্ঠা আছে। কিন্তু দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় চিত্ত বিবস।

এরই নাম আত্মপ্রবঞ্চনা। সমুদ্র যাত্রীদের মধ্যে দেখা যায়—এক প্রকৃতির লোক আছে—যারা জাহাজ ডুবির সময় জাহাজের

প্রকাণ্ড লৌহনির্ম্মিত জঠরে নিরপত্তার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ব'লে বেছে নেয়—এমন কি আরও কয়েকজনকে টেনে নিয়ে দল বড় ক'রে—একসঙ্গে সলিল সমাধি হয়। এ মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়—মানুষের—স্বীয় অস্তিত্বের সন্দিহান সূত্র হ'তে—স্বীয় জড়তার মোহপাশ-যুক্ত হোতে—স্বীয় অজ্ঞানের আধার হোত—এখন তিনি যত বড়ই বিদ্বেন হোন।

মানুষ ভুলে যায়—এতে সুখ নাই--নাই শান্তি--নাই আরাম। আছে শুধু বংশ পরম্পরায় একটা গ্লানি—একটা বৃহৎ পাষাণের ভার। বিদ্বের রুচি-ও সেখানে হার মানে—জ্ঞানের আলোও সেখানে ম্রিয়মান হয়। এক কাল-বৈশাখীর ঝড়- সে ব্যবধানকে তিরোহিত ক'রতে পারে—অথবা উন্মুক্ত কৃপাণ--নৃশংস হ'লেও বৃহৎ ব্যাপারে, উহাতে সু-ফলই দাঁড়ায়।

অরুন্ধতী কথা না বল্‌লেও, অন্যে তাহাতে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না। বাক্‌চাতুর্য্যের এমনি মাহাত্ম্য যে, সেখানে চুপ ক'রে থাকাটা অত্যান্ত অসোয়াস্তির কারণ। অপরে তা সহ্য ক'রবে কেন?

তাই মতিবাবু বল্‌লেন, তোমরা যে পথে চল্‌তে যাচ্ছো তা অমঙ্গল—দুঃখ তাতে অনিবার্য্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। সে পথে-ই তোমাদের চল্‌তে হবে।

অরুন্ধতী বল্‌ল, দুঃখ যে নেই সে বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ হ'তে পারি নে। কিন্তু দুঃখ যদি আসেই—ফেরবার পথ-ও যেন উন্মুক্ত থাকে। রোধ করার মধ্যে কোনই সার্থকতা নেই—সার্থকতা আছে—শুধু দিগন্ত প্রসারিত রুচি সম্পন্ন পথে। আর যে অপ্রসস্ত পথ একদিন পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের পথ নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন—সে পথ যে নির্ভুল নয়—সেটা কি আজও প্রমাণ হয় নি? একদিন

সতীদাহ ছিল, মনুষ্যত্বের প্রধান আবাহন—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ছিল স্বর্গের দ্বার—আর বহুদার গ্রহণ ছিল পুরুষকার। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন জ্ঞানের চর্চ্চা—যার চিহ্ন আজও কুতুবমিনারের শীর্ষভাগের লৌহখণ্ড নিমজ্জিত—যার দ্বিতীয় আজও পৃথিবীতে কেউ তৈয়রী ক'রতে পারে নি। তাঁরা মনোযোগ দিলেন অভ্যন্তরের ব্যাপারে—বাতায়ন বিহীন রুদ্ধ কক্ষের পানে। হয়ত তার প্রয়োজন সেদিন ছিল। কিন্তু একথাও ভুল্‌লে চল্‌বে না—আলো বাতাস যদি ঘরে বেশী দিন প্রবেশ কর্‌তে না পারে—তবে রাজার প্রাসাদই হোক বা ক্ষুদ্র গৃহই হউক—সে অট্টালিকারও আয়ুষ্কাল বেশীদিন ভরসা করা যায় না।

অরুন্ধতী আবার বল্‌ল, লক্ষকোটীর জীবনযাত্রার পথ প্রদর্শক—আজকে কোথায় গেল তাদের সেই লৌহ প্রাচীর? বিজ্ঞানের আলোক সম্পাতে—তাদের মিথ্যের জোড়াতালি ধরা প'রে গেছে। তাই আজকে সভ্য জগতের সম্মুখে—আমাদের বিকৃত অবস্থা ধরা পড়ে গেছে—আমরা সকল জাতিরই অনুকম্পার বস্তু—যেন তারাই আমাদের কল্যাণ কামনাকারী—তারাই আমাদের মুক্তিদাতা। আমরা ভুলে যাই যে—আমাদের মত তাদেরও একটা জঠর আছে—যা ইচ্ছেমত ছোটবড় করা যায়। যখন সমস্ত সভ্যজগত এগিয়ে চলেছে নতুনের সন্ধানে—আমরা পড়ে আছি— সে-ই একটী পঙ্কিল অন্ধকূপে। সেখানে না আসে আলো—না আসে বাতাস—না আসে সাগরের জোয়ার ভাটা—

শশধরবাবু একটী ভাঙ্গা চুরুট ধরাচ্ছিলেন। অরুন্ধতী আরও বল্‌ল, বুঝলেন কাকাবাবু—বাইরের জগত হ'তে যখনই এসেছে—একটু ফিনকি আলো—প্রাচীনরা বাঁধা দিয়েছে—চীৎকার ক'রে বলেছে "পরানুকরণ—ব্যভিচারে দেশ গেলো।" ব্যভিচারটা দেশের শত্রু—সে

বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশ অনুকরণ করেছে শুধু সেই আয়াসলব্ধ ব্যভিচারটুকু—ভালটুকুর স্বাদ গ্রহণ ক'রতে পারেনি—সে-টা যে কষ্টপ্রদ। কিন্তু বাইরের আলো বাতাসে যে রূপের অঙ্কুর আছে—তার মধ্যেই বা আপনাদের কতটুকু প্রাণশক্তি? দুরূহ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করতে না পেরে—সহজসাধ্য ব্যাপারটা আজকে সমাজের বুকের উপর খাঁড়িয়ে আস্ফালন করছে। এইত সভ্য-তা—এই-ত আমাদের উন্নতির সোপান! নির্ব্বোধ মানুষ যেখানে সীমাহীন অনন্ত আকাশের পরিকল্পনা ক'রতে পারে না—সেখানে এর বেশী, কি আর আশা করা যায়? আপনারা আমাদের প্রাচীন-তত্ত্বের মহিমায় গৌরবান্বিত কোরে তুল্‌তে পারেন নি—আপনারা নূতনতত্ত্বেও আমাদের দীক্ষিত ক'র্‌তে পারেন নি। তাই বলি, বাইরের আলো বাতাসে আপনারা দেখেছেন—শুধু বিজানু—বাঁচবার বীজমন্ত্র দেখ্‌তে পান নি।

ভাবমিশ্রিত চিন্তা যে অনেক সময় যুক্তিকে হারিয়ে দেয়—সে সন্ধান একদিন কতিপয় বণিক টের পেয়েছিল। তাই ভারত পরস্পর পরস্পরের মন কষাকষির ব্যাপারেই ব্যস্ত রইল—দেশের দূরস্থিত অঞ্চলে দ্বন্দ্ব দাঙ্গা প্রভৃতি প্রকটিত হোল। এমন কি শিক্ষিতেরাও সে প্রভাব অতিক্রম কর্‌তে পারেন নি! অথচ তারাই ন্যায়ের, যুক্তি—মনুসংহিতার ন্যানাকথা ব'লে আমাদের—শ্রোতাদের—মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন।

অরুন্ধতীর কথার পর দেখা গেল শশধরবাবু, রাখালবাবু, মতিবাবু ও অনুকুলবাবু একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

ভাবপ্রবণতা হোয়ে শশধর বাবু বল্‌লেন, যাই বলো অরুন্ধতী—যা ভঙ্গুর—তাকে কোনমতেই সম্মান দেওয়া যায় না।

রাখালবাবু গম্ভীর সুরে বল্‌লেন, অসম্ভব।

মতিবাবু শিরোশ্চালন ক'রে, মুখটী একটু বাঁকিয়ে বল্‌লেন, দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়া আর কি ?

অনুকুলবাবু তাঁর শিখেটা বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বল্‌লেন, ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

অরুন্ধতীর বুক্ থেকে বেড়িয়ে এল একটী দীর্ঘশ্বাস। ভাঙ্গা গলায় বল্‌ল, জগতের কোন বস্তুই যে চিরস্থায়ী নয় সে-টা আমরা মান্‌তে চাইনে। আজকে যে-টা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি—অদূর ভবিষ্যতে—আর সত্য ব'লে নাও থাক্‌তে পারে। একদিন সকলের বিশ্বাস ছিল—সূর্য্যই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘোরে—আজকে সে বিশ্বাস ঘুচে গেছে। কে জান্‌ত আগে যে—জলের ক্ষরধারার কর্ম্মপ্রেরণায়—জেগে ওঠে তড়িৎপ্রবাহ ও তার-ই সাহায্যে গ'ড়ে ওঠে কতশত পণ্যদ্রব্য—আকাশের তরিৎপ্রবাহের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল না। ভবিষ্যতের মিথ্যে দুশ্চিন্তায়—আজকে যা পেয়েছি—তাকে কেন ছেড়ে দেব ? যদি তারও আয়ুষ্কাল ক'মে আসে —তখন তাকেও দেব স্বচ্ছন্দে বিদেয়—নতুনের নেশায় আবার ছুট্‌ব। তবুও ত জগতের সাম্‌নে পরিচয় দিতে পার্‌ব !

শশধরবাবু, অনুকুলবাবু, রাখালবাবু ও মতিবাবু একযোগে অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে সমস্ত কথা শুনে যাচ্ছিলেন। সমরেন্দ্র, মণীন্দ্র ও কালু শুধু উষিপিষি কচ্ছিল—কিছু বল্‌তে অবকাশ পাচ্ছিল না—তারাও বক্তার দিকে চেয়েছিল।

তর্ক যখন অকস্মাৎ জটিল ভাবে আবির্ভাব হোল—শশধরবাবু বার বার জোড়ে তার চুরুটটা টান্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। চুরুট-টা যে কখন নিবে গেছে—তিনি টের্‌ই পাননি—তবুও তিনি টেনেই যাচ্ছেন।

রাখালবাবু তার নিটোল স্বাস্থ্যের প্রতি বার বার দৃক্‌পাত কর্‌তে লাগলেন।

মতিবাবু কথার খেই হাড়িয়ে ফেলে—জামার পকেটে শুধু হাত দিচ্ছিলেন—যেন ওর ভেতর-ই কোন অমূল্য সম্পদ লুক্কায়িত আছে।

আর অনুকুলবাবু বিজ্ঞ দার্শনিকের মত একদৃষ্টে অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়েছিলেন—মাঝে মাঝে দেখ্‌ছিলেন, তার শিখাটা ঠিক আছে কিনা।

কিছুক্ষণ পর অনুকুলবাবু পকেট হ'তে নস্যের ডিবে বের ক'রে এক টিপ নস্য নিয়ে—খুব জোড়ে নাসিকা দিয়ে নস্য গ্রহণ ক'রে বল্‌লেন, তোমাকে এ পরামর্শ যে-ই দিয়ে থাকুন, তিনি স্বদেশের কল্যাণের জন্য বলেন নি।

অরুন্ধতী বল্‌ল, কিন্তু দেশের মাটী কার?

উপস্থিত সবার চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে একযোগে তাকাল অরুন্ধতীর দিকে—একি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব—আজকে এই প্রবাসে রাতে অরুন্ধতী জানিয়ে দিয়ে গেল। অন্যদিকে শঙ্কা এনে দিল মনে—সবাই—চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌ল—অন্য কেউ শুন্‌তে পেল কিনা।

তখন দেখা গেল হীরেন অনাথকে নিয়ে ঘরের একটা কোনে বসে আছে। তারা যে কখন সকলের অগোচরে—সে স্থান দখল করেছে—কেউ মনে আন্‌তে পার্‌লে না।

এত সহজে যে পূর্ব্বেকার দৃশ্যের প্রবর্ত্তন হবে—কেউ আশা ক'র্‌তে পারে নি।

অরুন্ধতী, অনাথ ও হীরেন্দ্রকে দেখ্‌তে পেয়ে লজ্জিত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে অপরাধিনীর মত বল্‌ল, আমরা দেখ্‌তে পাইনি—আপনারা কখন এসেছেন। অতিথিকে আমরা সম্মান দিতে পারি নি।

অনাথ বল্‌ল, অসময়ে এসে আপনাদের আলোচনায় বাঁধা দিলুম।

শশধরবাবুও যে লজ্জিত হন নি—বলা চলে না। এখন বল্‌বার অবকাশ পেয়ে বল্‌লেন, না না তেমন কিছু নয়—বলে হাসির ছলে ঘরের স্বাভাবিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্‌লেন।

কিন্তু হ'তে দিলেন না রাখালবাবু। তিনি বল্‌লেন, আমাদের আলাপ হচ্ছিল—প্রাচীন আর নূতন তত্ত্বের বিরোধ নিয়ে। অরুন্ধতী প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। প্রাচীন—সব কিছু ভেঙ্গে, চূরে, ধুয়ে, মুছে,—ফেল্‌তে চায়। প্রাচীন—যা-কিছু—সব আবর্জ্জনা। আমরা বুড়োরা সব অকর্ম্মণ্য। ভবিষ্যত বংশধরদের সত্যের পথে নিয়ে যেতে পাচ্ছিনে—এই সব।

অনাথ মাথা নিচু ক'রে সমস্ত শুনে গেল। কিছু বলবারও কোন ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌ল না। কিন্তু সবাই তার মুখ হ'তে কিছু শোন্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্ কাট্‌ল। হঠাৎ সমরেন্দ্র বল্‌ল, সেদিন বিলেতের একটা পুরোনো মাসিক পত্রিকায় পড়্‌ছিলাম—একজন লেখক—সেদিনের স্পেনের রাষ্ট্রবিপ্লব নিয়ে লিখেছেন। তিনি বল্‌ছেন যে, স্পেনের রাষ্ট্রীয় গদি যখন, সমস্ত প্রাচীনরা দখল ক'রে বোস্‌লেন—তখন দেখা দিল পশ্চিম আকাশের এককোনে একটা ক্ষুদ্র মেঘ। শাসন কর্ত্তাদের বদ্ধমূল ধারণা হোল—তারা যাহা বোঝেন—এমন আর কেহ কল্পনা কর্‌তে পারে না। তাই তাদেরই মতে—দেশকে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টায় ব্রতী হোলেন। দেশের উন্নতিকল্পে নানা রকমের পরিকল্পনা—বুড়োদের পাকা মাথায় জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু স্পেন—রাষ্ট্রীয় সভায় তার অপহৃত স্থান অধিকার ক'রতে পার্‌ল না। তখন জেগে উঠ্‌ল—দেশের যুব শক্তি—তারা বল্‌ল, সহস্র বৎসরেও ঐ চেষ্টায়—দেশকে পুর্ণস্থাপিত কর্‌তে পারা যাবে না—এর মধ্যে নতুন ভাব দিতে হ'বে। কর্ত্তরা বল্‌ল—সে

সমস্যা যখন আমাদের—সে বিচারও আমরাই কোর্‌ব—তোমাদের সে বিচারের দায়িত্ব নিতে হ'বে না। ক্ষেপে উঠল যুব শক্তি। তারা বল্‌ল—দেশ যখন আমাদেরও—তার কল্যাণের নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা শুধু আপনারাই হবেন কেন? আমাদেরও যুক্তিপূর্ণ ভাব আছে। দেশে লাগ্‌ল বিরোধ ও রক্তা রক্তি। বৃদ্ধেরা সরে গেলন—যুব শক্তি জেগে উঠ্‌ল—কিন্তু স্পেনের ভাগ্যাকাশে ভবিষ্যতে কি আছে বলা যায় না—সে পরীক্ষার শেষ আজও শেষ হয় নি। হয়তো ভালোই হয়েছে।

সমরেন্দ্র তার বক্তব্য শেষে ক'রে চুপ ক'রে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কারও কথা ব'ল্‌বার বাসনা দেখা গেল না। সবাই যেন এক মহা জটিল সমস্যার সম্মুখীন—সবাই চিন্তাগ্রস্ত—যে কি একটা সমাধানে আসতে চাইছে।

সবাইকে চুপ ক'রে থাক্‌তে, দেখে অনুকুলবাবুই বেশী রকম অস্বস্তি মনে ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তাই তর্কটা একটু জাঁকিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা ক'রলেন।

কিন্তু আর সবাই তর্কের জালে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। শুধু কথা কাটা কাটি—বসে বসে পণ্ডিতের লড়াই—আর ভাল লাগ্‌ছিল না। এই সমস্ত কথা—মাথা গুলিয়ে দিয়ে যায়—মিমাংসা আর হয় না।

কাজেই অনুকুলবাবুকে বাঁধা দিয়ে মতিবাবু বল্‌লেন, হোয়েছে, হোয়েছে—আর নয়—রাত যে অনেক হোয়েছে—

শশধরবাবু এ কথা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন—অপ্রস্তুত হ'লেন। নেমন্ত্রিতদের এ পর্য্যন্ত অভুক্ত রেখেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চালিয়েছেন। তাই শশব্যস্ত হ'য়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, তাই-ত অত্যন্ত অন্যেয় হোয়ে গেছে। খাবারের কথা আমিও ভুলেই গিয়েছিলাম—দেখি যাই—

অরুন্ধতীও উঠে দাঁড়াল, বল্‌ল, কাকাবাবু আপনি ব্যস্ত হবেন না। সমস্তই আমি সন্ধ্যের আগেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছি—আপনি বসুন আমি জায়গার ব্যবস্থা ক'রে আস্‌ছি।

আমি জানি যে—মা-আমার কাছে থাক্‌লে—আমার কোন জিনিষ ভাবতে হয় না। আচ্ছা আমি বস্‌ছি—তুমি চট্‌কোরে সব সেড়ে আমাদের খবর দিও।

খাবার পর, আলাপ আলোচনা আর জম্‌লো না। রাত অনেক হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া কথা প্রসঙ্গে—যদি সেই পুরাতন তর্ক এসে পড়ে—তবে যে দিনের আলো না দেখেই সবাই বাসায় ফিরতে পারবেন—নিশ্চয় ক'রে কেউ বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। কাজেই—সবাই—আনুসঙ্গিক গৃহস্থলীর কথা অতি মৃদুস্বরে বল্‌ছিলেন। ভাবটা—এমন—ভাল-য় ভাল-য় বাড়ী পৌঁছছিলেই হয়।

গৃহস্থলীর সমস্ত কাজ শেষ ক'রে নিতে, অরুন্ধতীর বেশী সময় লাগ্‌ল না। অল্পক্ষণ পরেই অরুন্ধতী সে ঘরে প্রবেশ কর্‌ল। ঘরের আবহাওয়টা যে এমন হাল্কা হ'য়ে যাবে—ভাব্‌তে পারে নি।

তাই মৃদু হেসে হেসে বল্‌ল, অমন মুখ কালো ক'রে সবাই ব'সে আছেন! আমার ওপর রাগ হয় নি ত?

মতিবাবু বল্‌লেন, সে কি কথা! তোমার ওপর রাগ কর্‌বে কেন? তর্কের হার-জিত নিজেদেরই ওপর থাক্‌। ও বিচারের ভারের জন্য মনোস্তাপের কোন কারণই থাক্‌তে পারে না।

অনুকুলবাবু বল্‌লেন, তরকারীটা কিন্তু খাসা হয়েছে অরুন্ধতী—তুমি ক'রেছ?

অরুন্ধতী এবার হেসে দিল। বল্‌ল, আপনার অনুমান কি?

রাখালবাবু বল্‌লেন, তরকারীটার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে—যার জন্য অরুন্ধতী কে তারিফ কর্‌তে হয়।

অরুন্ধতী লাজ্জিত হোল। অন্য কিছু বল্‌তে না পেরে মস্‌লার ডিবেটা নিয়ে—সবার সম্মুখে ধর্‌তে লাগ্‌ল।

সমরেন্দ্র অনাথকে বল্‌ল, আপনি নিশ্চয়ই আর কয়েকদিন আছেন!

না আমি পরশু চলে যাচ্ছি।

শশধরবাবু বল্‌লেন, আর একদিন যাবার আগে আমার এখানে আস্‌বে না?

রাখালবাবু বল্‌লেন, এ জায়গাটা আপনার কি রকম লাগ্‌লো।

অনাথ বল্‌ল, বেশ লাগ্‌ছে।

অনুকুলবাবু বল্‌লেন, একদিন আমার ওখানে ও নিশ্চয়ই যাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মতিবাবুও বল্‌লেন, আমার ওখানে-ও যাবেন নিশ্চয়-ই।

কালু বল্‌ল, আমার এখন উঠতে হোচ্ছে—আমার আবার duty আছে।

মনীন্দ্র বল্‌ল, সে ত বারটায়।

কালু বল্‌ল, এগারটা ত বেজে গেছে—আর বাকী কি?

সবাই দেওয়ালে টানান ঘরির দিকে তাকিয়ে ভাবিত হ'য়ে উঠল।

শশধরবাবু ইজিচেয়ার হ'তে আস্তে আস্তে উঠে দাড়ালেন। অরুন্ধতীকে বল লেন, মা তুমি কি এত রাত্রে বাসায় যাবে?

অরুন্ধতী বল্‌ল, আজকে আমার বাড়ী ফিরতে-ই হ'বে। এ কয়দিন আর বাসায় যাই-নি। কি যে হ'য়ে রয়েছে কে-জানে।

তবে হীরেন তোমায় পৌছে দিয়ে যাবে এখন।

সবাই একযোগে উঠে দাঁড়াল। একে একে সবাই বাড়ীর দিকে চ'লে গেল। রইল শুধু হীরেন, অনাথ আর অরুন্ধতী।

ওরা তিনজনেও শশধরবাবুর নিকট বিদেয় নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়্ল।

হীরেনের বাড়ী অরুন্ধতীর বাসায় যাবার পথে। অরুন্ধতী হীরেনের বাড়ীর কাছে এসে বল্ল, হীরেনবাবু আপনার আর কষ্ট কর্তে হ'বে না। এটুকু পথ আমি এমনিই যেতে পারি—আর অনাথবাবু-ত আছেনই—আপনি বাসায় যান—

সমস্তদিন আফিসে কাজ কোরবার পর, একটু তাড়াতাড়ি বিশ্রেমের আশায়—হীরেন আর আপত্তি কর্ল না। সে বল্ল, অনাথ তুমি তবে তোমার পথে গুরু-মাকে পৌঁছে দিয়ে যেও।

তারপর হীরেন নিজের বাসায় চলে গেল। অরুন্ধতী আর অনাথ পাশাপাশি চ'লেছে—নির্জ্জন পথে—সমস্ত রাস্তায় কেউ কারও সঙ্গে কথা বল্ল না। বাসার দরজার কাছে যখন দু'জনে এল অনাথ বল্ল, আমি এখন যাই।

অরুন্ধতী বল্ল, তুমি ক'বে যাচ্ছো।

পরশু।

না—আর দু'একটা দিন থেকে যাও—কোন ক্ষতি হ'বে না!

অনাথ হঠাৎ কোন জবাব দিতে পার্ল না।

অরুন্ধতী দরজায় কড়াঘাত কর্তে কর্তে বল্ল, কাল বিকেলে আমার এখানে এসে খেও।

অনাথের উত্তরের আগেই, দাড়োয়ান দরজা খুলে দিল। অরুন্ধতী ভেতরে ঢুক্তে ঢুক্তে বল্ল, কাল্‌কে আসতে ভুলো না।

অনাথ চলে গেল। অরুন্ধতী ঘরে ঢুকে ক্লান্ত দেহটা অমনি বিছানায় এলিয়ে দিল। না বদ্‌লালো জামা কাপড়—না চাইল ঘরের পাশে। অমনি প'ড়ে রইল সব।

(৮)

অনেক বেলায় অরুন্ধতীর ঘুম ভাঙ্‌ল। মাথার কাছে জানালাটা দিয়ে রোদ এসে ঘরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শরতের সোনালী রোদ তার চোখে অমন সুন্দর আর কোনদিন লাগেনি। কত বসন্ত প্রভাত, কত শরতের সকাল—সন্ধ্যা, জীবনে এসেছিল। কিন্তু প্রাণে কোনদিন সাড়া দেয় নি। প্রকৃতি কত উপাদান নিয়ে এসে মানুষের দ্বারে আঘাত করে—কিন্তু সে উপাদান অন্তর দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে পারে ক'জন? ক'জনের সম্ভব হয়—জীবনের নব প্রেরণাকে অন্তর দিয়ে ভোগ কর্‌বার। এ কেনা-বেচার দুনিয়ায়—মানুষের সমস্ত সত্ত্বা ডুবে থাকে সার্থের সঙ্গে সার্থের দ্বন্দ্বে। সে দ্বন্দ্ব অস্বীকার ক'রে নিছক বেঁচে থাকার বাইরে—যে সত্য রয়েছে তাকে অভিনন্দিত ক'র্‌বার যোগ্যতা ক'জনের থাকে।

চোখমেলে চাওয়া মাত্রই অরুন্ধতীর মনে হ'ল আজকের জন্মদিনে লোকজন আস্‌বে, তাদের খাবার-দাবার আয়োজন ক'র্‌তে হ'বে। ঘরের সর্ব্বত্র অগোছান। গুছান—মাজা-ঘসা সব পড়ে আছে। কিন্তু আজ তার কি হ'লো বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছেনা। মন তাগিদ দিচ্ছে—কিন্তু উঠ্‌তে পাচ্ছেনা। কি হ'বে উঠে? ঘর-কন্না সে পাতেনি, তবুও ঘর-কন্নার সব হাঙ্গামাই জুটেছে। কি জন্যে এ'সব?

বিছানায় চিৎ হ'য়ে পড়ে রইল। চোখের সাম্‌নে খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। দীগন্ত বিস্তৃত মাঠ—সোনালী রৌদ্রে ছেয়ে গেছে। মাঠের শেষে তালের বন—চোখের দৃষ্টিকে বহুদূর টেনে নিয়ে যায়। দূরে গ্রামের গাছ-পালা অস্পষ্ট চক্রবালরেখার সঙ্গে মিসেছে। আর সাম্‌নে চষা ক্ষেত। গ্রামের ভেতর যাবার কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে এখনও গরুর গাড়ী বা লোক চলাচল কর্‌তে আরম্ভ করেনি। সর্ব্বত্র সোনালী রৌদ্র—আর নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি।

অরুন্ধতীর নানা এলো-মেলো চিন্তা মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। বাবা-মা-ভাই-বোন-বন্ধু-বান্ধব সবাইর কথা। সবাইর সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা কি ক'রে সম্ভব হ'লো? দিনান্তে একদিনের জন্যে তাদের কথা মনে পড়েনি। এতো স্নেহ, এতো মমতা, শুকিয়ে যাওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'লো? প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হ'তো—বিশেষ ক'রে মার জন্য—আর সবাইর ছোট বোন সিপ্রার জন্য। না-জানি সে এখন কতো বড়ো হয়েছে। হয়তো বিয়ে হয়েছে। সুন্দর তার বর—সুন্দর তার ঘরকন্না ছেলেপিলে। ভারি ইচ্ছে করে তাদের খবর নিতে। মা-বাবা, নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। আর যদি বেঁচে থাকেন? উঃ, এতোকাল ধ'রে দুঃখভোগ কর্‌বার জন্যে বেঁচে আছেন। জীবনে সুখী হবার মতো সব রকমের প্রাচুর্য্য-ইতো তাঁদের ছিল—মানুষের সাধারণ কাম্যের সব কিছু-ইতো তাদের ছিল—অনাবিল স্বচ্ছন্দ গতিতে তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। জীবন সন্ধ্যের শেষপ্রান্তে এসে পেলেন আঘাত। সে আঘাতের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আর সে আঘাতের জন্য দায়ী সে নিজে। এক জনের জন্যে—সমস্ত পরিবারের সুখ আর শান্তির পথে ব্যাঘাত ঘট্‌ল—এতোগুলো লোকের শান্তির পরিকল্পনা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু সত্যি কি—সে দায়ী? না সমাজ—যে সমাজ

নারীকে মানুষের পর্য্যায়ে গণ্য করেনি। পুরুষের গড়া সমাজে নারীর ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করাও ব্যভিচার। মুহূর্ত্তে ভেসে যায় পিতামাতার স্নেহ—আত্মিয়-স্বজনের আদর আপ্যায়ন—চিরদিনের যারা সহচর তারা যায় দূরে স'রে। এটা হোতে বাধ্য—সমাজের বিধান মান্‌তেই হ'বে। সংস্কারের মতো মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়—সে বিধান। মৃত্যুর মতো কঠোর ও নিষ্ঠুর সমাজের বিধান। তার কাছে যুক্তি নেই, তর্ক নেই, মিমাংশা নেই, দয়া নেই, মমতা নেই, কোন প্রকার বন্ধনের শিথিলতা নেই। পাথর ঘষে ক্ষয় করা যায়, কিন্তু সমাজের বিধান অক্ষয়—অমর—অচল।

অদ্ভুত সে বন্ধন। কত মহামানব এলো—জীবন দিল বিসর্জ্জন। কত ভাবধারার বন্যা বয়ে চলে গেল দেশের বুকে—কিন্তু নড়ল-না সমাজের সনাতন বিধান। কি করে এতো কঠোর—এতো নির্ম্মম—এতো একগুয়ে হলো এ বিধান? এ নিষ্ঠুর অচলায়তন—কোন শক্তির বলে বলীয়ান হ'য়ে গড়ে উঠেছে? মনের এ প্রশ্নের কোন জবাব পেলনা অরুন্ধতী। অন্ধকারে ঘুরে এল—পথ হাতড়িয়ে মর্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ তার মন বলে উঠ্‌ল—সংস্কার!—সংস্কার! তা নাহ'লে তার বাবা-মা কি ক'রে অমন কঠোর হ'তে পার্‌লো? অমন নির্ম্মম আঘাত দেয়া তাদের পক্ষে কি ক'রে সম্ভব হ'লো? কি করে অমন নির্দ্দয় হ'লো তারা?

এতো সহ্যগুন যাদের—তারা কি ক'রে অমন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ্‌ল? কত লোক, কত দিন—কত ভাবে তাদের আঘাত করেছে—ঠকিয়েছে—লাঞ্ছনা দিয়েছে। সব-ইতো তারা অম্লান বদনে সহ্য করেছে। জীবনের সকল আঘাত তারা বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু তার বেলায়—তাদের প্রিয়তম

কন্যার বেলায়—কোথায় গেল তাদের অসীম সহনশীলতা—সে অপূর্ব্ব ক্ষমা—আর বিচার বুদ্ধি? কোথায় গেল তাদের উচ্চশিক্ষা আর তার মার্জ্জিত রুচি? কি তার অপরাধ? সমাজের কি অকল্যাণ সে করেছিল—কি ধর্ম্মহানী হতো তাতে? এটা কি তার বাবাও বুঝ্‌তে পার্‌লেননা যে—অমলকে বিয়ে করা তার পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব নয়। এটা সে বুঝিয়ে দিয়েছিল—সব রকমের অমত জানিয়ে দিয়েছিল—তার জীবন পণ্ড হ'য়ে যাবে—বেঁচে থাকা সম্ভব হ'বে না—জগতের—আলো—বাতাস—রূপ-রসগন্ধ বিলীন হয়ে যাবে জীবন থেকে। সব—সব তাদের বুঝিয়ে বলেছিল। এও বলেছিল যে, মানুষের জীবনে দেহটাই সব নয়। অমল-কে সে কি ক'রে বি'য়ে করে—তাকে সে কিছুই দিতে পার্‌বে না—এই দেহ নিয়ে সে কি কর্‌বে? কিন্তু আশ্চর্য্য! অরুন্ধতীর বাবা এ সব কথা নেহাৎ অর্থহীন বলে মনে কর্‌লেন। নেহাৎ ছেলেমানুষী—ভাবপ্রবণতা—যা দু'দিন পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কত মেয়ে, কত ছেলেইতো ওরকম বলে। কিন্তু বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যায়। তারাও নির্ব্বিবাদে ঘর-কন্না করে—ছেলেপুলে মানুষ করে—সুদিনে দুর্দ্দিনে স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়ায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বিগত দিনের সব ব্যাপার—সব কথা—সব স্মৃতি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—মুছে যায়—বিগত দিনের সব কিছু। জীবনের বর্ত্তমান হয়ে ওঠে একমাত্র সত্য—আর সব মিথ্যে—স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় সব। সংসার অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যবসায়ী—অরুন্ধতীর বাবা—এ বিচার বুদ্ধিতে কন্যার অমতেই এ সম্বন্ধ স্থির কর্‌লেন। কারণ অমলের মতো ভাল সম্বন্ধ নেহাৎ কপাল জোরেই মেলে। অমলের মতো খাঁসা ছেলে বাংলা দেশে আর কটি আছে? বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-অর্থ-

সম্মান—যা-কিছু নারীর কাম্য হ'তে পারে—সব-ই আছে। তাকে অরুন্ধতী কেন প্রত্যাখ্যান ক'র্‌বে? ছেলেমান্‌ষী—নেহাৎ ছেলেমান্‌ষী! পাঁকা ব্যবসাদার—মনে মনে স্মিতহাস্যে অরুন্ধতীর সব যুক্তি তর্ক উড়িয়ে দিয়ে, বিয়ের দিন স্থির ক'রে ফেল্‌লেন।

ক্রমশঃ বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। বিয়ের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌ল। আত্মিয়-স্বজনের আনাগোনায় ছোট্ট বাড়ীতে স্থানাভাব ঘট্‌ল! কল-হাস্যে বাড়ী মুখোরিত হয়ে উঠ্‌ল।

অরুন্ধতী নীরব—নির্ব্বাক—ক্লান্ত—অবসন্ন তার দেহ-মন। বিদ্রোহ করার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। তার এ নির্ব্বাক ও নির্লপ্ত ভাব—বাড়ীর সবাই—লজ্জা ও অতি সুখের অভিব্যক্তি মনে ক'রে খুশিই হ'লো।

তার পর এলো বিয়ের রাত। আলোয়, বাদ্যে, কোলাহলে ডাক্‌-হাকে—বাড়ী ভেঙ্গে পড়্‌ল। বড়যাত্রীর দল এসে গেল—বর সঙ্গে ক'রে। উঠ্‌ল হুলুধ্বনী—আর অবিরত মোটরের হর্ণ। চল্‌ল হৈ চৈ ডাক্‌ হাক্‌। বিয়ের সভা বস্‌ল। পীড়িতে বর বস্‌ল। পুরুত হাঁক্‌ল—কন্যা নিয়ে এসো—দেরী কর্‌লে শুভলগ্ন চলে যাবে।

বাড়ীর ভেতর খোঁজ্‌ খোঁজ্‌—অরুন্ধতীকে পাওয়া যাচ্ছেনা! পাওয়া যাচ্ছেনা তো—যাচ্ছে-ইনা। এরকম অসম্ভব কথা কে ক'বে শুনেছে? বিয়ে বাড়ীতে, বিয়ে লগ্নের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মেয়ে নিরুদ্দেশ! এতো লোকজন—আলো—এর মধ্যে কি ক'রে সম্ভব! খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ রব পড়ে গেল—অন্দরমহলে—বাড়ীর বাইরে—আর পাড়ায়। খবর-টা ঘন্টাখানেকের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়্ল—সহরের সর্ব্বত্র। সারা-সহরময় খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য—বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেল—ফের লগ্ন এলো—কিন্তু অরুন্ধতীকে পাওয়া গেলনা। এদিকে বর-পক্ষ চটে আগুন অনুনয় বিনয়, হাত-ধরা, পা-ধরা, ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করা স্বত্ত্বেও তাদের ঠাণ্ডা করা গেলনা।

বাবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্ল। তিনি সমস্ত লোকের সাম্নে চেঁচিয়ে বল্লেন "আমার মেয়ে মরে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর সঙ্গে জোর করা চলেনা—তাকে ক্ষমা করুন—আমাকে ক্ষমা করুন। আমার মতো আপ্নারাও মনে করুন আমার মেয়ে মরেছে। মৃত্যুর পর কোন সম্পর্ক থাকেনা। আমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।"

বরপক্ষ চলে গেল সে রাতেই—জলগ্রহণ না ক'রে। মধ্য রাতে বাড়ীটা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আলো নিভে গেল—বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল—নেমন্ত্রিতদল অভুক্ত চলে গেল। বাড়ীতে যারা এসেছিল —তারাও অনেকে গা ঢাকা দিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বিয়ে বাড়ীটা একটা পড়ো বাড়ীতে পরিণত হ'লো। সর্ব্বত্র নীরব—স্তব্ধ—কোথাও জন-প্রাণীর টু-শব্দ নেই। কেবল একপাল কুকুর ভাঁড়ার খোলা পেয়ে নেমন্ত্রিতদের আহার্য্য নির্ব্বিবাদে খেতে লাগ্ল। মাঝে মাঝে তাদের কাড়াকাড়ি মাড়ামাড়ির শব্দ শোনা যায়। আর শোনা যায়—একটা ঘর-থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস।

ভোর হ'লো। দিবালোকে ব্যাপারটা আরও কদর্য্য ভাবে প্রকাশ পেল। নানা রকমের কানাঘুষা চল্লো। অশ্লিল আর কদর্য্য ইঙ্গিতে ঘটনাটা পল্লবিত হ'য়ে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়্ল। এ নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা চল্ল—বেশ রসাল ক'রে—ছাত্র মহলে—বুড়ো মহলে ও

মহিলা মহলে। ভেতর খবর কেউ নিলে-না—নেয়া সম্ভব নয়। দোষারোপ থেকে অরুন্ধতীর বাবা-মা বাদ পঁড়্লেননা। বিশেষ ক'রে বৃদ্ধরা দোষটা তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। তারা-নাকি জানেন না—কি ক'রে মেয়ে বড়োহ'লে সাম্লে রাখ্তে—কি ক'রে নৈতিক চরিত্র ভাল কর্তে—কি শিক্ষা—কি আদর্শ তাদের সাম্নে দাঁড় কর্তে হয়। অনেক কিছুর ওপর দোষারোপ কর্লে—মেয়েদের শিক্ষা—বড়োকরে বিয়ে দেয়া—অবাধ মেলামেশা - থিয়েটার—সিনেমা—এমন কি নাটক-নভেল পড়া-ও বাদ পড়্লনা।

বিচিত্রহীন, ভেতো বাঙ্গালী জীবনে একটু গরম-হবার খোরাক দিলে—এ বিপর্য্যয়। সহরময় কয়েকদিন বেশ চল্ল—হৈ চৈ। কাগজে খবরটা উঠ্ল। সমাজের পঙ্কিল ঘেটে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে যে সব সম্পাদক—তাদের কয়েকদিনের খোরাক জুটে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে সবাই ভুল্তে লাগ্ল। কিন্তু বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলনা—অরুন্ধতীর পরিবার। সমাজে তাদের হঠাৎ অপরাধির মতো চলাফেরা কর্তে হ'তো—অতি সন্তর্পনে তাদের কথা বল্তে হতো। নেহাৎ না গেলে নয়—এমন স্থান ছাড়া তারা যেতোনা। তাদের বাড়ীতে কেউ পার্তে আস্তোনা—নেমন্তণও কর্তোনা। তারাও নেমন্তনে যেতোনা। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরাও—পীড়ন হ'তে বাদ পড়ল না।

সবচাইতে বিপদ হলো অরুন্ধতীর বাবার। সমাজের সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলা মেশার ওপরই নির্ভর কর্তো—তার ব্যবসা। সে পথ তাঁর এখন বন্ধ হ'য়ে গেল। এতো মাইনে দিয়ে কোম্পানী তাঁকে Branch manager এর পদে রাখ্তে চাইলে না। কাজ ক'মে যাওয়ায় কোম্পানীর

ক্ষতি হোচ্ছিল। হাজার লোকের টাকা খাটিয়ে যে ব্যবসা চলে—সে ব্যবসায়—একজনের অক্ষমতার জন্যে ক্ষতি স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত কিছুতে-ই হ'তে পারে না।

কাজেই তাঁকে চাক্‌রী ছেড়ে, সহর ছেড়ে দেশের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হ'লো। কিন্তু গ্রামে তার টেঁকা দায় হ'লো। সেখানে সমাজের বন্ধন বেশী কড়া। দেড় বছরে একটুও স্নথ হোল-না। এক-ঘ'রে হ'য়ে রইলেন তিনি। সমাজ করলে তাকে এক-ঘ'রে—আর তিনি নিজে আশ্রয় নিলেন ঘরের বিছানায়। সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠ্‌লেন না। এক বছর যেতে না যেতে স্ত্রী-র অবস্থাও তাই হ'লো।

এদিকে অরুন্ধতী কলকাতা এসে দু-চোখে অন্ধকার দেখ্‌লে। এতোবড়ো কলকাতার সহরে স্থান কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? সসম্মানে বেঁচে থাক্‌বার কোন যোগ্যতা তার রয়েছে? কি সম্পদ তার আছে? পুরুষের গড়া সমাজে—পুরুষ চালিত এ জগতে—পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে—কিসের জোরে সে তার দু-মুঠোর ব্যবস্থা করে নেবে? পশ্চাতে তাঁকাবার সুবিধে নেই—সে পথ যে আরও ভীষণ অন্ধকার। সেদিকে সে তাকাতে পারে না—ভাবতে গেলে তার দেহ মন অবসন্ন হয়ে আসে। ভুল্‌তে চায়,—ভুলে যেতে চায়, —বিগত দিনের সব কিছু। এ স্বাধীন দেশ নয়—যেখানে হাজার রকম পথ খোলা রয়েছে—মেয়েদের জন্য—ছোট, —বড়ো—শিক্ষিত—অর্দ্ধশিক্ষিত—অশিক্ষিত—সবাইর জন্য পথ খোলা রয়েছে—জীবনের দায়িত্ব গৌরবে বোয়ে নেবার জন্য। কিন্তু এখানে পদে পদে বিপদ--পদে পদে মানুষের নিম্নস্তরে নেমে যাবার ডাক,— চারদিক থেকে। কেউ সহ্য কর্‌তে চাইবে না—সে মাথা উচু কোরে

চলে যায়। কেউ তাকে ন্যায্যপ্রাপ্য দেবে না! ছলে, বলে, কৌশলে, নানা ভাবে—নানা ইঙ্গিতে—তাকে টান্‌বে—পঙ্কিল গহ্বরে। সে গহ্বরে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে—কতো আয়োজন—কতো ব্যবস্থা, —কত অর্থ ব্যয়।

গানের মাষ্টারী ক'র্‌ল—নারী কল্যাণ আশ্রমে গেল—কিন্তু কোনটায় টিক্‌তে পার্‌ল না। সবটাতেই পরোক্ষভাবে সে এক আয়োজন—কৌশলের ফাঁদ—পঙ্কিল গহ্বরে টেনে নেবার ফাঁদ—যা—কোন নারী জীবনের দীনতম অবস্থায়ে-ও বর্‌দাস্ত ক'রতে পারে না।

আঘাতের পর আঘাতে ঘায়েল হ'তে হ'তে চল্‌লো তার জীবন—এক গ্রহ হ'তে অন্য এক গ্রহে—জানে-না—কোথায় তার শেষ গতি? কোথায় মিল্‌বে তার বিশ্রাম ও আশ্রম? সমাজের আঘাত থেকে বেঁচে থাকা—কৃচ্ছ্রসাধনার আঘাত হ'তে নিজের জীবনকে সগৌরবে ব'য়ে নেবার দুর্ব্বার আকাঙ্খা—তার জীবন হ'য়ে উঠ্‌ল কঠিন। লোপ পেল তার—নারী সুলভ কোমলতা—জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ ভাব।

এমনি সংগ্রামের দিনে—জীবনের ক্ষারতাপে দগ্ধ হওয়ার দিনে—পরিচয় হ'লো অনাথের সঙ্গে। সে আজ দশ বছরের কথা। কিন্তু আজ মনে হয় যেন সে—এক ভুলে যাওয়া দিনের দুঃস্বপ্ন। আজ আর সে পুরুষের উপযোগ্যা—তাদের নগ্ন কামনার ইন্ধন যোগারের জন্য নয়। দুনিয়ার পথে এখন সে একটু স্থান ক'রে নিতে পেরেছে। হোক তা অল্প পরিসর। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে মাথা উচু ক'রে জগতের দিকে তাকাতে পারে। সমাজের বুকে—তার স্থান—পরগাছার মত নয়।

সে তার নিজস্ব সত্তা গ'রে নিয়েছে। পঙ্কে পা আট্‌কে যাবার দুর্দ্দিন কেটে গেছে—কেটে গেছে প্রলুব্ধ হবার দুর্ব্বলতা। কঠোর হয়েছে দেহ মন—অভিজ্ঞতার ক্ষারতাপে। আঘাত যে কর্‌তে আস্‌বে—আঘাত পেয়ে ফিরে যেতে হবে তাকে।

কিন্তু আজ একি হ'লো। কোথা থেকে এলো এ ঘূর্ণী হাওয়া জীবনের সব কিছু ওলট পালট ক'রে দিতে চায়। কালো বৈশাখীর জন্য মানুষ প্রস্তুত থাকে—অমন দিনে গহীন গাঙ্গে পাড়ী দিতেও—নৌকা ডুবির ভয় থাকে না। কিন্তু এ যে বসন্ত প্রভাতের ঘূর্ণি হাওয়া। এর জন্যে তো কেউ প্রস্তুত থাক্‌তে পারে না। সে আর যাই হোক—অতি মানবী নয়। মানুষের রক্তে—মানুষের গড়া দেহে আশ্রয় ক'রে আছে—তার মন। এ আঘাত তো বাইরের আঘাত নয়—যার জন্যে সে প্রস্তুত। ঝড় উঠেছে অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে। তার সঙ্গে বোঝাপড়া চল্‌ছে।

এমনি সময় স্কুলের ঘড়িতে বাজ্‌ল দশটা। দশটা বাজ্‌ল—আর সে শুয়ে আছে! রাত্রি জাগরণ নয়—অসুখ নয়—তবু দশটা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে আছে? নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হ'ল। ভাগ্যিস, আজ ছুটী কোন কাজ কর্ম্ম নেই স্কুলের। তা হ'লেও আজকে তার জন্মদিন—বন্ধুবান্ধবদের খাবার আয়োজন রয়েছে। পড়ে রয়েছে—আরও কত কাজ। না—এবার উঠ্‌তে হোল।

ঘরে ঢুক্‌লো ঝি—রূপোর মা। রূপোর-মাও ঘাবরিয়ে গেল—অরুন্ধতীকে অসময়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে। গত তিন বছরের মধ্যে—অসুস্থ শরীরে অরুন্ধতীকে সে কখনও বিছানায় দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

পড়ে না। রূপোর-মা অরুন্ধতীর কপালে হাত দিয়ে বল্‌ল, হবেনা—জ্বর না হয়ে যায় কোথা। এতো খাট্‌নী খাট্‌তে—তিন তিনটে ঘোড়াও পারে না—বাঃ বাঃ। তোমার উঠে কাজ নেই আজ। রান্না যা'—আমিই কর্‌বো।

কিন্তু আমায় যে রান্না করতেই হবে আজ রূপোর মা। আজকে আমার জন্মদিন। কয়েকজন খাবেন—

ওমা! বলে কি গো। জ্বর নিয়ে জন্মদিন কি গো? ভাল হ'য়ে জন্মদিন কোরো।

ধ্যাৎ; জন্মদিন বুঝি সুবিধে বুঝে আসে। আমার কিছু হয়নি—তুই যা—রান্না ঘরে—আমি আস্‌ছি—

রূপোর মা চলে গেল—অরুন্ধতী বিছানায় উঠে বস্‌লো। কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রল। কিন্তু পার্‌ল না। দেয়ালের গায়ে টানান আয়নাটায় চোখ পড়তেই সে চম্‌কে উঠ্‌লো। মুখের এ কি শ্রী হয়েছে। চোখ বসে গেছে—মুখ ভেঙ্গে গেছে—রং ময়লা হয়েছে—চোখের দৃষ্টি হয়েছে নিস্প্রভ। অনেকক্ষণ আয়নার দিকে চেয়ে রইল।

স্বাস্থ্যবতী বলে অরুন্ধতীর নাম ছিল। এজন্যে জীবনে অনেক অসুবিধায় পড়ে-ও—ফিরে আস্‌তে পেরেছে। জীবনের সম্পদের মতো—সে তার স্বাস্থ্য দস্তুর মতো সাধনা করেছে। তার রূপ ছিল—তপোক্লীষ্ট তপস্বিনীর ন্যায়। এতোকালের সাধনার ফল—অজ্ঞাতে চুরি হোচ্ছে কালের কড়া নিয়মে। একে বুঝি আর ধ'রে রাখা যাবে না। মন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। জীবন তো শেষ হয়ে এলো—আর ক'দিন? কিন্তু কিছুই তো হোলোনা—জীবনের কোন পুঁজোই তো সাঙ্গ হ'লোনা।

এমনি সময় রামদিন বাজার নিয়ে এসে হাজির হ'লো। বড়ো একটা ঝাকায় অনেক জিনিষ এনেছে। তরি-তর্‌কারি, মাছ, মাংস, ফলমূল, নানা রকমের মিষ্টি—সব বাজারের বাছাই করা জিনিষ।

অরুন্ধতী বাজার দেখে খুসি হ'লো—মনের মতো জিনিষ এনেছে রামদিন। পশ্চিমা হ'লেও—বেশ চালাক এ রামদিন—বুঝে খরচ করে। অরুন্ধতী তরকারী কাট্‌তে বসে গেল। একটু পরেই হয়ে গেল—অন্যমনস্ক। ছেব্‌ড়ার পাত্রে তরকারী রাখে—আর তর্‌কারী পাত্রে ছোব্‌রা রাখে। কয়েক মিনিট পরে চেয়ে দেখে—সব-মিলে ডালখিচুরী হ'য়ে আছে। নিজের ওপর চট্‌ল।

রান্নার সব কাজ এগিয়ে চল্লো। সব কাজ করে গেল অন্যমনস্কতার মধ্যে—দ্বন্দ্বের মধ্যে—এ যেন জীবনের এক নতুন সমস্যা—নতুন সংগ্রাম। জীবন মধ্যাহ্নের বেলাভূমিতে পৌঁছে একি সংগ্রাম আরম্ভ হোল? এক নতুন অনুভূতি—নতুন জাগার পুলক—আর ভয়ের সংমিশ্রন। এ অনুভুতি জাগে জীবনের প্রথম প্রভাতে। এ অকাল বসন্ত প্রভাতকে অভিনন্দিত কর্‌বার সময়তো—আর তার নেই। সে সময়তো বহুদিন হ'লো চলে গেছে।

প্রায় চারটা যখন বাজে—অরুন্ধতী রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এল—ক্লান্ত—অবসন্ন—দেহ—মন। গা-কাপড় ধুয়ে সে-যখন বিশ্রামের জন্য বস্‌ল—তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আজ তার জন্মদিন। একটু সাজ-গোজ কর্‌বার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু সে আর হ'লোনা। এমনি অবসাদ দেহ ও মন।

বসেই আছে—নেমন্ত্রিতদের আস্‌বার সময় হ'য়ে গেছে—সে খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে দু-একজন এলেন—নেহাৎ মামুলি কথা বলে তাদের অভ্যর্থনা কর্‌লে।

একে একে সবাই এল। শশধরবাবু পর্য্যন্ত। কিন্তু অনাদ এলো না। জন্ম-দিনের উৎসব আরম্ভ হয়ে—শেষ হ'তে চল্‌ল—কিন্তু অনাথ আর এল না।

খাওয়া দাওয়ার পর একে একে সবাই বিদেয় নিল—বাড়ীটা নিঝুম হ'লো। কেবল বসে রইলেন শশধরবাবু ও হীরেন্দ্র। শশধরবাবু ইজি চেয়ারটায় শুয়ে—সিগার টান্‌ছিলেন। রাত যখন দশটা বাজ্‌ল তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। ইস্—অনেক রাত হয়েছে তো। বলে চুপ করে রইলেন। কাট্‌ল আরও কয়েক মিনিট। পরে বল্‌লেন, এবার যেতে হয়—আচ্ছা, কি হয়েছে তোমার বলো তো মা!?

অরুন্ধতী বল্‌ল, কিছু না তো—

আর যাই ক'রো মা এ বুড়োর চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে না এ দু'টো চোখ অনেক কিছু দেখেছে—এ চোখ ভুল দেখে না।

না কাকাবাবু হয়নি তো কিছু—শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

দেখ্‌তেইতো পাচ্ছি—যাচ্ছে না। দিনের পর দিন এরূপ খেটে গেলে ক'জনারই বা শরীর ভাল থাকে? তোমাকে কতদিন বলেছি মা এ ভাবে আর স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রো না। সেদিকে তোমার হুঁসই নেই। এখন দুদিন বিশ্রাম নেও। কি দরকার ছিল—আজকে এত সমারোহ ক'রবার?

অরুন্ধতী এই অভিযোগে লজ্জিত হ'য়ে, অধবদনে বসে রইল। কোনই উত্তর দিল না।

হীরেন্দ্র সুযোগ দেখে বল্‌ল, গুরুমার এটাই বড় দোষ। নিজের সত্তাকে এভাবে বিলিয়ে দেবার মধ্যে কোন্ সার্থকতা আছে—আমি বুঝতে পারছি না।

হীরেন্দ্র আরও কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু শশধরবাবু বাধা দিয়ে ব'ল্লেন, কিন্তু অনাথ আজকে এল না কেন? তারপর অরুন্ধতীর দিকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন, তোমার সঙ্গে কোন ঝগড়া হয় নি তো?

অরুন্ধতী শিরশ্চালন করে, জানিয়ে দিলে—না।

তারপর শশধরবাবু যেন নিজের মনেই ব'ল্তে লাগলেন, এই ছেলেটাকে যতবারই দেখেছি—ততই বিস্মিত হয়েছি। পরিচয় বেশী দন হয় নি—তবু কেন যেন তাকে ভাল লাগে।

তারপর একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ সাম্‌লে নিয়ে বল্লেন, হীরেন্দ্র তুমি যাবার পথে, অনাথের বাসাটা একবার দেখে যেও তো। কোন বিপদ—

শশধরবাবুর কথাটা সমাপ্ত হোল না। হীরেন্দ্র বল্‌ল, আপনারা ভাববেন না। নিশ্চয় সময় ক'রে উঠ্‌তে পারে নি—ওটাই ওর স্বভাব।

শশধরবাবু বল্‌লেন, স্বভাব বললেই তো প্রশ্নের মীমাংশা হয় না। যাক্‌ এখন তবে উঠি—কি বল মা—অনেক রাত হ'য়ে গেছে। চল হীরেন্দ্র—

কাকাবাবু হীরেন্দ্র কখন চলে গেছেন—খেয়াল নেই অরুন্ধতীর। হুঁস্‌ যখন হোল—তার কানে তখন বার বার প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে স্বভাব ও অভ্যাসের গোল কোথায়। কোনটা বড কোনটা ছোট। কোনটা পরিহার্য্য, কোনটা অপরিহার্য্য।

(৯)

পরদিন খুব সকালে অরুন্ধতী ঘুম থেকে উঠে নিজেকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ল। ঠিক কর্‌ল বিশ্রেম—আর কাজ—কাজ—আর বিশ্রেম এই নিয়ে থাক্‌বে সে। এ দু'য়ের মধ্যে আর কোন ফাঁক দেবে না। ফাঁক্ পড়লেই—নানা চিন্তা ভুতের মতো পেয়ে বসে। সে ভুতের হাত থেকে পরিত্রাণ সহজে পাওয়া যায় না। কি লাভ বিগত দিনের দিকে তাকিয়ে? কালের ক্ষারস্রোতে—যদি জীবনের শ্রেষ্ঠদিন গুলোই অনর্থক ভেসে গিয়ে থাকে। সেগুলোতো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কালপ্রবাহ এগিয়ে নিয়ে চলেছে—জীবন—যৌবন। এগিয়ে যাওয়াই জীবনের ধর্ম্ম—পেছনের দিকে ফিরে তাকাবার সময় যে নেই। সময়ের তালে—পা ফেলে চল্‌তে হবে.—অবসর নেই—ভেবে দেখ্‌বার সময় নেই—স্মৃতি নেই—নেই অনুশোচনার সুযোগ। কালচক্রের আবর্ত্তনে তাল সাম্‌লিয়ে—যা-কিছু অবলম্বন হাতের কাছে এসে পড়ে—তাকে আঁক্‌ড়িয়ে—ধীরে চল্‌তে হবে। যত ক্ষুদ্রই হোকনা সে অবলম্বন—তাকে উপেক্ষা ক'র্‌বার সুযোগ নেই।

অরুন্ধতী অস্বাভাবিক ব্যস্ততায় সবকিছু করে যেতে লাগ্‌ল—ছোট বড়ো—সব কাজ। নিজের কাজ—স্কুলের কাজ—কাজ! কাজ! কাজ! এ ছাড়া বেঁচে থাক্‌বার আর কোন অর্থ-নেই—তার জীবনে। হঠাৎ এ

মনোভাব স্বাভাবিক নয়—এ যেন বিদ্রোহী মন—চাপ কিয়ে বোঝাটেনে নেবার মতো।

অরুন্ধতীর এ ভাবান্তর স্কুলের সবাই লক্ষ্য কর্‌লো। অবশ্য স্কুল চালনায়—কোথাও কোন গরমিল ছিল না। সাধ্য নাই—কেউ কোন রকম ত্রুটি ধ'র্‌তে পারে।

স্কুলের পড়ান থেকে—ব্ল্যাকবোর্ডের চক্ পর্য্যন্ত—কোনটাই—তার দৃষ্টি এড়াতে পার্‌তোনা। অরুন্ধতী সবাইকে যেমন স্নেহ ক'র্‌তো—আবার কঠোর হোতেও পার্‌তো। কাজ কি কোরে আদায় কোরে নিতে হয়—সে শিক্ষা ভাল করে-ই আয়ত্ত করেছিল। সে জান্‌তো কি ক'রে বড়োলোকদের খুশীকোরে—স্কুলফণ্ডের জন্য টাকা আদায় কর্‌তে হয়। তেম্‌নি টাকার যাতে অপব্যয় না হয়—সেদিকেও তার কৃপণের সতর্ক দৃষ্টি। সর্ব্বোপরি—পড়াবার অপূর্ব্ব কৌশল সে আবিষ্কার করেছিল। পড়াবার সময় সে হ'য়ে যেতো আত্মহারা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেড়িয়ে যেতো—সে পড়া—পড়িয়েই যেতো। ছাত্রীরা সম্মোহিত হ'য়ে শুনে যেতো—যতো কঠিন বিষয়ই হোক। যতো নিরস বিষয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে সে পড়াতো—ছাত্রীদের কাউকে কোনদিন অমনোযোগী হ'তে দেখা যায়নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পড়িয়ে চলেছে—বক্তার কি শ্রোতাদের কারো ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি।

এক শ্রেণীর লোক আছে যারা জীবিকাকে জীবিকা-হিসেবে গ্রহণ ক'রেনা—জীবনের সাধনা হিসেবে গ্রহণ করে। অরুন্ধতী সে শ্রেণীর।

সে-দিন পূজো-প্রাঙ্গনে অনাথের হঠাৎ দেখা মিল্‌ল—একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। বহুদিন পরে। আশা কর্‌তে পারেনি। কোনদিন এমন দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আসে-নি। সে রাতের মতো অমন কাকুতি-মিনতি—কোনদিন তার মুখ থেকে বেরোয়নি। না-জানি অনাথ

কি মনে করেছে। কেন কাল রাতের নেমন্তণে এলো না—কে-জানে। হয়-তো সন্দেহ করেছে। সন্দেহ! অরুন্ধতীকে সন্দেহ—অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। যে অরুন্ধতীকে সন্দেহ করা চল্‌তো—সে মরে গেছে। আজ্‌কের এ অরুন্ধতীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। বেঁচে থাক্‌বার দুঃখের ক্ষারতাপে—সে নারী অরুন্ধতী। মেয়ে অরুন্ধতী মরে গেছে। সমস্ত প্রলোভনের নদ-নদী পেরিয়ে আজকের অরুন্ধতী লাভ করেছে নব-জীবন। তার যাত্রাপথে নেই প্রলোভন—নেই উচ্ছ্বাস—নেই উত্তাপ। সব শিথিল শান্ত। কেবল বেঁচে থাকা আর কর্ত্তব্যের ব্রত উৎযাপন—সে ব্রত উৎযাপনের মধ্যে ফললাভের আশা নেই—নেই কোন অভিষ্ট বরলাভের প্রার্থনা।

এম্‌নি ক'রে মনের মধ্যে চল্‌লো আন্দোলন। শেষটায় স্কুল ছুটী হবার আগেই বাড়ী ফির্‌ল। মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কর্‌লো—তার শরীর আজকে ভাল নেই—বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু অরুন্ধতী হয়তো জান্‌তো না—যে শারীরিক বিশ্রাম মানুষের হাতে—কিন্তু মনের বিশ্রাম মানুষের হাতে নেই।

বাড়ী ফিরে শুয়ে পড়ল—চোখের সাম্‌নে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। সেদিকে নির্লিপ্তভাবে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। ঐ কাঁচা রাস্তা দিয়ে গ্রামের লোক বাড়ী ফির্‌তে লাগল। মাঠে এলো সহরের লোক—বেড়াতে—ছোট—বড়ো—বুড়ো। চোখে পড়্‌ল ছোট্ট একটা পরিবার। স্বামী স্ত্রী আর দুটী ছেলে-মেয়ে। তাদের অরুন্ধতী চেনে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক। সাহেবগঞ্জে ছোট্ট একটী বাড়ী করেছে—ছোট্ট একটু ফলের বাগান—আর ফুলের বাগান। সামান্য আয়—কিন্তু কি সুন্দর তাদের ঘর-কন্না। অভাব-অনটন রয়েছে—অসুখ-বিসুখ রয়েছে—হয়তো দাম্পত্য কলহও মাঝে

মাঝে হয়—কিন্তু তবুও কি সুন্দর। কি সুন্দর ঐ ছেলে-মেয়ে দুটী। ওদের মুখ চেয়েই যে-কোন বাপ-মা জীবনের সহস্র অভাব-অনটন ভুলে থাক্‌তে পারে। তারপর রয়েছে তাদের জীবনে স্বপ্ন। নিজেদের স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে—তবে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার—বড়ো করার স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাক্‌তে পারে। অরুন্ধতীর জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে—নতুন ক'রে স্বপ্ন গড়ে উঠ্‌বার কোন অবলম্বন নেই।

এমন সময় বাড়ী গেটে একখানা গাড়ী থাম্‌ল। বিছানা ছেড়ে ওঠ্‌বার শক্তির লোপ পেল।

মা কেমন আছো, ব'লে ঘরে ঢুক্‌লেন শশধরবাবু।

অরুন্ধতী ধরফর ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জবাব কিছু বের হ'লো না।

শশধরবাবু নিরবে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়্‌লেন। তারপর একটা সিগার ধরিয়ে আস্তে আস্তে টান্‌তে লাগ্‌লেন। চুপ্‌চাপ চল্‌লো অনেকক্ষণ। পরে বল্‌লেন, অনাথ এসেছিল?

না

আশ্চর্য্য! তারতো আজ্‌কে সকালে আসার কথা।

আপ্‌নি জান্‌লেন কি ক'রে?

আমি লোক পাঠিয়ে তার খবর নিয়েছিলাম—বোধ হয় কোন কাজে আট্‌কে গেছে।—বলে একটু থাম্‌লেন। তারপর আবার বল্‌লেন, কি জানি মা মঙ্গলময়ের কি উদ্দেশ্য রয়েছে—আমাদের প্রতি কর্ম্মের পেছনে। তিঁনি চালান তাই আম্‌রা চলি—তিনি যন্ত্রী—আমরা যন্ত্র। এইতো জানি।

এটা আপ্‌নি বিশ্বাস করেন? আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন—একজন চালান—তাই আম্‌রা চলি—

শশধরবাবু মৃদু হেসে বল্‌লেন, বিশ্বাস করি বলেইতো চলে যাচ্ছি—কোথাও ঠেক্‌তে হয় না। সকল ভার তাঁর ওপর চাপিয়ে বেশ আছি।

সকল ভার আর একজনের ওপর চাপিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দিন কাটান ক্লীবত্বের অভিব্যক্তি নয়-কি ?

না—মা এতে ক্লীবত্বের প্রকাশ পায় না। সকল ভার মঙ্গলময়ের হাতে সঁপে দিতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন। ক্লীবের কাজ নয় সে-টা। আত্মবিশ্বাস যার আছে—সেই মঙ্গলময়ের বিশ্বাস কর্‌তে পারে।

কিন্তু যা-রা আত্মবিশ্বাসের ওপরেই চ'লে—নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায়—তারা ত শুধু নিজেদের শক্তির জোরে-ই চলে যাচ্ছে। তারা—ক'বে বর্ষা নাম্‌বে—আর তাদের ক্ষেতে বীজ দেবার সময় হবে—সে ভরসাতে ত' থাকে না। তারা নিজেরাই নিজেদের উপায় স্থির ক'রে নেয়—তারা নিষ্ফলতার জন্যেও ভগবান কে দোষ দেয় না—অদৃষ্ট-কে-ও করাঘাত ক'রে না। তারা—তাদের কি অবলম্বন আছে—কাকাবাবু ?

একই কথা হ'লো মা—একই কথা হ'লো। আসল কথা হোচ্ছে আনন্দ। আনন্দ যেখানে আছে সেখানেই কল্যাণ—সেখানে-ই মঙ্গল।

কিন্তু কর্ত্তব্যের মধ্যে সে আনন্দ কোথায় ? জীবনে বেঁচে থাক্‌বার কৃচ্ছ্রসাধনায়—কোথায় আনন্দ ?

কেউ তার জীবনের কর্ত্তব্যে—কি কোন সাধনায়—আনন্দ যদি না পায়—তবে ব্যর্থ হ'বে তার সাধনা—ব্যর্থ হ'বে সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টা।

অরুন্ধতী ও শশধরবাবু দু'জন-ই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। দু'জনই চিন্তামগ্ন। বিভিন্ন বিষয়ে তারা চিন্তায় বিভোর হয়েছিল। একই ঘরে বসে দু'টি প্রাণী বিভিন্ন জগতে ঘুড়ে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ শশধরবাবু ডাক্‌লেন, 'অরুন্ধতী'! যেন বহু দূর দেশ থেকে এ ডাক এল। অরুন্ধতী চম্‌কে উঠ্‌ল। শশধরবাবু বল্‌লেন, বুঝ্‌লে অরুন্ধতী আমি পরপারের ডাক্‌ শুন্‌তে পাচ্ছি। জানতো এ ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।

অরুন্ধতীর চোখ ছল ছল ক'রে উঠ্‌ল। বল্‌ল, মৃত্যু-চিন্তা মনে স্থান দিয়ে—বার বার কেন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ্‌ ক'র্‌বেন? আমরা কি আপ্‌নার কেউ নই—আমাদের মনেও-তো কষ্ট হ'তে পারে।

শশধরবাবু অরুন্ধতীকে নিকটে টেনে এনে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, দুঃখ কেন ক'র্‌বে মা, আমিতো ঠিক সময়েই যাচ্ছি। মঙ্গলময়ের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে—তাই ডাক পড়েছে। মৃত্যু শুধু অবস্থার পরিবর্ত্তন—মা। এত লেখাপড়া শিখে—তোর চোখেও জল—পাগলি-মা—বলে শশধরবাবু অরুন্ধতীর চিবুক স্পর্শ ক'রলেন। আবার ব'ল্‌লেন, আমার সব কাজ সাঙ্গ হয়েছে—তবে যাবার আগে একটা কাজ শেষ করে যেতে হ'বে।

আপনার আবার কি কাজ বাকী রইল?

হ্যাঁ রয়েছে একটা কাজ—সে তেমন কিছু নয়। সমস্ত জীবনের পরিশ্রমে যা কিছু জমেছে—সে-গুলোর একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে পার্‌লেই—জীবনের সব কাজ সাঙ্গ হয়।

এ-কথা ব'লে শশধরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌লেন। অরুন্ধতী দূরে সরে বস্‌ল।

শশধরবাবু একটু চিন্তাকরে বল্‌লেন, আশিহাজার টাকা জমিয়েছি—কিন্তু কিছুই হোলনা।

আশিহাজার! বা-বা—অনেক টাকা জমিয়েছেন কাকাবাবু। অথচ আপ্‌নার যে এতো টাকা রয়েছে বোঝা-ই যায় না—বলে অরুন্ধতী হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সে হাসিতে শশধরবাবুও যোগ দিলেন। কিন্তু একটু পরেই হাসি মিলিয়ে গেল। মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লেন, কার জন্যে খরচ ক'রবো—ছেলেপিলে নেই—তোমার কাকীমা মারা গেলেন—জীবনের প্রথমেই। আপ্‌নার বল্‌তে-তো আর কেউ রইল না। ভগবান জন দিলেন না—দিলেন শুধু টাকা—যার বিশেষ কোন প্রয়োজন হোল না।

কথাগুলো অরুন্ধতীর প্রাণেও বেজায় লাগ্‌ল। সে বল্‌ল, আপ্‌নার কেউ নেই—কোন আত্মীয় স্বজন ?

হ্যাঁ আছে—সে তুমি। আত্মীয় বলো—বন্ধুবল—কন্যাবল—দুনিয়ায় থাক্‌তে—এক তুমিই আছো। আমার সব কিছুর মালিক একা তুমি। আমি তোমাকেই সব দিয়ে যাচ্ছি। আমার ব্যাঙ্কের টাকা—আর এ বাড়ীটা—এ স-ব তোমারি। তুমিই সত্যিকারের মালিক।

অরুন্ধতী অবাক হয়ে বল্‌ল, আমি! আমি কি ক'রে অতো টাকার মালিক হ'বো! সে হ'তে পারে না—কিছুতে-ই না।

শশধরবাবু জোর দিয়ে বল্‌লেন, তোমাকেই সব দিয়ে যাবো—তোমাকে-ই—আর কাউকে না।

অরুন্ধতী বেজায় অবাক হয়ে গেল। বল্‌ল, এ'তো সামান্য টাকানয়। আশিহাজার। যাকে তাকে ফেলে দেয়া যায় না। বুঝে শুনে চিন্তাকরে কাউকে দিয়ে যান। টাকার সত্যিকারের ব্যবহার হ'বে, কাকাবাবু।

টাকার সত্যিকারের ব্যবহার জানে—এমন জন আমার নেই—একমাত্র তুমি ছাড়া।

অরুন্ধতী অনেকক্ষণ বসে বসে ভাব্‌ল। শশধরবাবুও চুপকরে রইলেন।

পরে অরুন্ধতী বল্‌ল, যদি কেউ না থাকে—তবে এ টাকা দেশের কোন জন-হিতকর কাজে দিয়ে যান। তাতেই টাকার সত্যিকারের ব্যবহার হ'বে। এ দরিদ্র—অশিক্ষিত দেশে—কত কাজ পড়ে রয়েছে ক'রবার। কতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে—অথচ কাজ কর্‌তে পাচ্ছেনা—টাকার অভাবে। আশি হাজার টাকা—ক'ত কাজ হ'তে পারে। এ টাকায় হাজার হাজার লোকের উপকার হ'বে। দেশের শিক্ষা—স্বাস্থ্য—নীতি কিছুই করা যাচ্ছেনা—এ নিরন্ন দারিদ্রপীড়িত দেশে—শুধু—টাকা—টাকার অভাবে।

শশধরবাবু বাধাদিয়ে বল্‌লেন, না—না—ও সব আমি কোর্‌বোনা।

অরুন্ধতী জিদ্ করে বল্‌ল, কর্‌তেই হ'বে। ওদের দেশে কোটীপতি—সমস্ত টাকা দান ক'রে যান—দেশের জনহিতকর কাজে। প্রতিদিন কত প্রতিষ্ঠান ওদের দেশে গড়ে উঠ্‌ছে—এ সব দানের টাকা দিয়ে। আর এ দরিদ্র দেশে যে দু'চার-টা বড়োলোক আছেন—তাঁরা একটা পয়সা রেখে যান না—যাতে দেশের লোকের একচুল উপকার হ'তে পারে। অথচ দানের তো এ দেশে-ই প্রয়োজন বেশী। কি করেন আমাদের দেশের পয়সাওয়ালারা? পুত্র পুত্রাদি না থাক্‌লে ধার ক'রে নেন। তাতে ছেলেদের—ছেলের ছেলেদের জাহান্নামে যাবার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়ে যান। আমাদের দেশে বড়ো লোকের ছেলেরা—প্রথম থেকেই ধারণা করে—তাকে আর খাট্‌তে হবে না—সে এসেছে টাকার অপচয় কর্‌তে—বুকের রক্ত দিয়ে যে সম্পদ জমা হয়েছে—তা ফুঁকে দিতে। এই-তো হয় আমাদের দেশের বড়োলোকদের টাকার ব্যবহার। টাকার এ অপব্যবহার থেকে কে বাঁচাবে এ দেশকে?"

শশধরবাবু অবাক হয়ে বল্‌লেন, কিন্তু তুমি তো আর টাকার

অপব্যবহার কর্‌বে না। তোমার তো সে ইচ্ছে হ'তেই পারে না, —অরুন্ধতী।

কে বল্‌তে পারে। হাতে টাকা পড়্‌লে মনের পরিবর্ত্তন হ'তে কতক্ষণ? পরিশ্রম না ক'রে যে টাকা পাওয়া যায়— তার-জন্য মানুষের মায়া হ'তে পারে না।

ভূধর শিখর থেকে—গিরিবর্ত্ত পার হ'য়ে—তুষার গ'লে চলে— তৃষ্ণার্ত্তকে পিপাসা মুক্ত ক'রতে। গিরিরাজ—তার সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়—পরের তরে সহস্র ঝরনায়। স্রোতস্বিনী জেগে ওঠে। নদী তখন কুলুকুলু নাদে ছুটে চ'লে—দেশ থেকে দেশে। তৃষ্ণা নিবারন ক'রে মর্ত্ত্যের লোক।

দাতা ও গৃহীতা উভয়েই হয় তৃপ্ত—উভয়েই পায় শান্তি। দাতা মনে ক'রে না—পাত্র—অপাত্র। গৃহীতাও চোখে দেখে না—কি এ'তে সন্নহিত।

তাই আজকে স্নেহের আতিশয্যে হয়—গরম উৎপাদন।

শশধরবাবু বল্‌লেন, তুমি কি বোলচ-অরুন্ধতী—আমি ত কিছু-ই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

অরুন্ধতী বল্‌ল, কাকাবাবু—জীবনের দায়িত্ব আপনাকেই কেন্দ্র ক'রে শেষ হয় না। সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে—জাতির প্রতি—প্রতি মানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে—যাকে আমরা উপেক্ষা করে এসেছি— শত শত বৎসর ধ'রে। ভুলে যাই স্বীয় আত্মার সঙ্গে জাতির আত্মার সম্বন্ধ—বাঁচতে চাই শুধু নিজে—

শশধরবাবু বল্‌লেন, স্বকীয় পরিস্থিতি কি তবে প্রয়োজন নেই?

জাতিই যদি যায় মরে—তবে দেউলিয়া হয়ে গৃহের পানে ফের্‌বার পথে—না আছে কোন সার্থকতা—না আছে দানের কোন মর্য্যাদা।

ঝরা গাছের বৃন্ত থেকে—যে ফুল ফোটে—তার রং হয় ময়লা—সৌরভ হয় স্বল্প। সোলার ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার মধ্যে কোন আনন্দ নেই।

হোক্‌না সোলার ফুল—ঘরবাড়ী-তো দেখ্‌তে সুন্দর লাগ্‌বে।

প্রচলিত মুদ্রাযন্ত্রের পরিবর্ত্তে কাগজের বিনিময় যন্ত্র প্রচলনের সমস্যা গুরুতর—ওটা শুধু দেউলিয়া হ'য়ে যাবার ভয়ে নিজেকে ঠকান—ও গোঁজামিলের শেষ অতি শঙ্কাজনক।

কিছুক্ষণ পর অরুন্ধতী আবার বল্‌ল, ভ্রমর জানে তার আয়ুষ্কাল বেশী দিনের নয়। যা কিছু আহার সে সংগ্রহ ক'রে—সে সঞ্চয় ক'রে একযোগে—তাদের চাকে। কেউ যদি চুরি ক'রতে আসে—সহস্র সহস্র ভ্রমর ধেয়ে চলে—আততায়ীর দিকে। তাদের স্নেহের ওপর সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু তাদের একটা আপেক্ষিক সঙ্গা আছে—যার জন্য হাজার রকমের কীট পতঙ্গ হ'তে তারা বিভিন্ন।

শশধরবাবু বল্‌লেন, জীবনের সন্ধ্যেকালে আমার আর ভাববার সময় নেই—অরুন্ধতী—

অরুন্ধতী বল্‌ল, কিন্তু জীবনের ইতিহাসের মীমাংসা তো হোল না। মানুষের ভেতরের কর্ত্তব্য অনেক বড়—সে-টাই জাতির প্রাণ। এলিযাবেথ ইংলেণ্ডের রাণী হ'য়ে—দৈনিক রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ ক'রলেই—হয় ত—তাঁকে—কেউ দোষারোপ ক'রতে পারত না। কিন্তু তিনি তার-থেকে বড় কর্ত্তব্য ক'রলেন। ইংলেণ্ড ও সে-দিন হ'তে—জ্ঞানে—বুদ্ধিতে—রাজ্যবিস্তারে—অর্থে বলীয়ান হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি চেয়েছিলেন—জগত জানুক—ভাল বল্‌তে ইংলেণ্ড কিরূপ ভাল মনে করে—সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বল্‌তে—কি বোঝায়। এর উৎস হয় হৃদয়ের কোণ হোতে—যে হৃদয় জাতির অংশ। আমরা যে জাতির অঙ্গ—তা-ই জাতি আমাদের মুখাপেক্ষী—

শশধরবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বল্‌লেন না। পরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌লেন, জানিনে সে দেশের খবর—জান্‌তে আমি চাই-নে। আমার যদি মেয়ে থক্‌তো—তবে তাকেও তোমার চাইতে বেশী ভালবাস্‌তে হয়ত পার্‌তুম্ না।

এ কথার পর অরুন্ধতী আর তর্ক কর্‌তে সাহস পেলনা। অথচ শশধরবাবুর দান গ্রহণ কর্‌বে বলে—স্বীকারও কর্‌লেনা। সে কেবলি ভাবছিল—অতো টাকা দিয়ে সে কি কর্‌বে? শশধরবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

অরুন্ধতী বল্‌ল, চল্‌লেন নাকি?

হ্যাঁ, মা। যেতে হবে এখন—রাত নেহাৎ কম হয়নি। তাছাড়া শরীরটা মোটেই ভাল না। আর ক'তকাল—সময়তো হয়ে গেছে—যাবার তাগিদ আস্‌ছে বার বার—বিধাতার এজ্‌লাস থেকে—

অরুন্ধতী ব্যাথা পেল। কিন্তু আলোচনার বিষয় পরিবর্ত্তনের জন্য বল্‌ল, আপ্‌নাকেতো একটু 'কোকো' করে দেয়া উচিত ছিল—ভুলেই গেছি কি আশ্চর্য্য!

কালকে এসে, তোমার এখানে-ই কোকো খাবো। কি ব'ল?

আসতে-ই হবে। বলুন—আস্‌বেন।

আস্‌ব—আর অনাথকে ব'লে আসব—তারও চায়ের নেমন্তন্ন তোমার বাড়ীতে।

না—না তাকে ব'লবার দরকার নেই—তার অনেক কাজ—নিজের কাজ—সমিতির কাজ—সে হয়তো সমিতির কাজেই এখানে এসেছে—

শেষের কথাগুলো শশধরবাবুর কাণে গেল কিনা বোঝা গেল না। তিনি ততক্ষণে গাড়ীতে চেপে বসেছেন।

অনাথ নিজের ওপর চটে উঠ্‌ল। একদিকে ব্যবসার নানা ঝঞ্ঝাট—একদিকে সমিতির সমস্যা—অন্যদিকে অরুন্ধতীর আহ্বান। কোনদিকে তাল সামলাবে—সে? সবদিকে তাল সাম্‌লাতে গিয়ে কোনটা-ই হোচ্ছেনা। না ব্যব্‌সা—না দেশের কাজ। অথচ কোনটাই তার কাছে ছোট নয়। গ্রাসাচ্ছাদনের একটা উপায় মাত্র মনে করে অনাথ ব্যব্‌সায় নামেনি। ব্যবসা নিয়েছে সে জীবনের আদর্শ হিসেবে—দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন যেমন দেখে—তেম্‌নি দেখে ব্যব্‌সায় তার উন্নতি। তাই ব্যব্‌সায় এসেছে তার নেশা—লাভ ক্ষতি কোনটাই তাকে দমাতে পারেনা। লাভ ক্ষতির প্রশ্ন গৌণ—মুখ্য ব্যব্‌সা—ব্যব্‌সা চালান। নির্লিপ্তভাবে সে চালিয়েছে—তার ব্যব্‌সা। মাতাল যেমন নেশায় বিভোর হ'য়ে থাকে—তেম্‌নি সে বিভোর হ'য়ে থাকে ব্যব্‌সায় —আর ব্যব্‌সার চিন্তায়। আর সব কিছু ভুলে যায়—ভুলে যায় আহার নিদ্রা—সুখ—স্বাচ্ছন্দ্য—আরাম—বিরাম। ভুলে যায় আর সব কর্ত্তব্য।

ব্যবসার নেশায় মাতাল হ'য়ে যখন চলেছিল—সমিতিতে লাগ্‌ল ভাঙ্গন। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। সাহেবগঞ্জ এসেছিল সমিতির ব্যাপারেই—কিন্তু ব্যব্‌সার গন্ধ পেয়ে সব গেল

ভুলে। বিভোর হয়ে গেল ব্যবসায়। হুঁস যখন হ'লো—তখন দেখ্‌ল কোন কাজই হলো না—সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়েছে—না হয়েছে ব্যবসা—না হয়েছে সমিতির কাজ। কাজেই সে বেজায় চট্‌ল নিজের ওপর। ব্যর্থতার গ্লানিতে সে তার আত্মবিশ্বাস হারাতে বস্‌ল। কোনদিনের কোন ব্যর্থতাই—তাকে অমন কাবু কর্‌তে পারেনি। চিরকাল সকল রকমের পরাজয় স্মিতহাস্যে উড়িয়ে দিয়েছে—মনে কোনদিন দাগ কেটে যেতে পারেনি। আজকের এ পরাজয় তার মনে এনেদিয়েছে অবসাদ—যে অবসাদ সে কিছুতেই ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌ছে না। অনাথের মনে হ'তে লাগল আর বুঝি সে উঠ্‌তে পার্‌বে না—জীবনের ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুঝ্‌তে পার্‌বে না।

আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান—এতোকাল ঝড়ের রাতে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় শিকড় নড়েছে—কিন্তু পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে—কোন আঘাতই গোড়া উপ্‌ড়িয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু আজ তার আত্মবিশ্বাসের গোড়া খুইয়ে গেছে—গিয়েছে তার জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে।

এমন সময় এলো শশধরবাবুর পত্র। বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছেন। চিঠি পেয়ে অনাথ অনেক কথা ভাব্‌ল। কি হ'বে গিয়ে? তার জীবনে এ সব আন্তরিকতার কিইবা প্রয়োজন?

কর্ত্তব্যের পথ থেকে দূরে—বিপথে—টেনে নিতে চায় এ সব আন্তরিকতা। এ সব তো—তার জন্যে নয়। প্রেম—ভালবাসা—স্নেহ—মমতা—এ সবতো তার পথের কণ্টক। সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। বেলা তখন তিন্‌টে—সেই থেকে সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিশেহারা হোয়ে। গায়ে গেঞ্জি—পায়ে চটি। না করেছে স্নান—না মুখে

দিয়েছে কিছু। এ অবস্থায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহরের রাস্তা ছেড়ে নিজের অজ্ঞাতে—গ্রামের পথ ধরেছে। গ্রামের পর গ্রাম হেটে চলেছে—উদ্দেশ্য বিহীন। পথের লোক অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—গ্রামের কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠেছে। চল্‌তে চল্‌তে কোথায়ও থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। হয় তো এক রাস্তা দিয়েই অনেক বার ঘুরেছে। গ্রামের লোকেরা কেউ ভাব্‌ল পাগল—কেউ ভাব্‌ল গুপ্তচর। দুষ্টু ছেলের দল তার পেছন পেছন হৈ চৈ কর্‌তে কর্‌তে এলো—গ্রামের বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস কর্‌তে চাইল—কোথাথেকে আস্‌ছে—কোথায় যাবে। কিন্তু সঠিক কোন জবাব পায় নি। অনেক স্থানে এমন কথা বলেছে—যা অর্থহীন দুর্ব্বোধ। কোথাও প্রশ্নের উত্তরে কেবল একটু হেসে—হন হন ক'রে চলে গেছে। কোথাও ইংরেজীতে এমন কিছু বলেছে—যার অর্থ আর যাই হোক—কারো নাম-ধাম নয়। এমন কিছু তাকে টেনে নিয়ে চলেছে যার ওপর অনাথের হাত নেই। তার মনে হ'লো সমস্ত কিছু প্রয়োগ ক'রেও—সেই অজ্ঞাত শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষে ক'রতে—আর পারবে না।

এম্‌নি হয়—সবাইর জীবনে হয়। তার চাইতে অনেক শক্তিমান পুরুষের জীবনেও হয়। মানুষ যখন জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলে—তখন তাকে রক্ষে কর্‌বে কে? দরিদ্র মাতাল যখন মদের দোকানের দিকে ছোটে—তখন কি জানে না—কোন্ নরকে সে ডুবে মর্‌তে চলেছে? অভুক্ত স্ত্রী—পুত্র—কন্যার মুখ কি মনের কোনে ভেসে উঠে না? অভুক্ত শিশু পুত্র-কন্যার কান্নার-রোল কি বহুদূর থেকেও তার কাণে ভেসে আসে না? পূর্ণ মদের গ্লাসে—তার দরিদ্র গৃহের সকল নগ্নতা কি ভেসে ওঠে না? স্ত্রীর চোখের

লোণাজল মদের গ্লাস কি তিক্ত করে দেয়না? সে কি বুঝ্‌তে পারেনা —কি নিষিদ্ধ পাণীয় সে পান কর্‌ছে? যা পান কর্‌ছে—তা' তার পিতৃত্বের বিরূদ্ধে—স্বামীত্বের বিরূদ্ধে—মানবতার বিরুদ্ধে—ন্যায়ের বিরূদ্ধে। তবুওতো সে খাচ্ছে। তাকে খেতে হয়। এমনি আসে মানুষের জীবনে ধ্বংসের ডাক—মাতাল হবার ডাক—যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। অনাথের মনে হ'ল—আজ্‌কে এসেছে তার জীবনে—সে ধ্বংসের ডাক—তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পারবে না কেউ সাহায্য কর্‌তে এগিয়ে আস্‌বে না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তার দিদি অরুনার কথা! আজ তাঁকে চাই—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'বে। কিন্তু কোঁথায় তিনি? গত দশবৎসরের মধ্যে দেখা শুনা নেই—চিঠি-পত্র লেখার সুবিধে নেই। তা' হোক—তার দিদি নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। তাকে না জানিয়ে অরুণা দিদি চলে যাবেন—হতেই পারেনা। যেমন করেই হোক —তার দিদির খবর নিতে হ'বে—তাঁকে খুঁজে বের কর্‌তে হ'বে। তাঁকে আজ অনাথের একান্ত প্রয়োজন। জাহান্নামের পথ থেকে টেনে আন্‌তে পারে—তার দিদি। জোরজুলুম ক'রে নয়—বক্তৃতা দিয়ে নয়—প্রেরণা দিয়ে নয়—অর্থ সাহার্য্য করে নয়। শুধু তাঁর উপস্থিতি। শেষ সাক্ষাতের দিন পায়ের ধূলো মাথায় নেবার সময় বলেছিলেন "আমার আশীর্ব্বাদ তোমাকে চিরদিন রক্ষা কর্‌বে"—দিদির আশীর্ব্বাদ চাই। আজ্‌কের দিনে ব্যব্‌সা নয়—সমিতি নয়—শুধু চাই দিদির আশীর্ব্বাদ। নারীত্বের অতো বড়ো আদর্শ অনাথের চোখে আর পড়েনি।

অনাথ ফিরে চল্‌ল ঘরের পানে। দিদির কথা স্মরণ হওয়ায় সে তার সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। এক নব প্রেরণা নিয়ে সে ছুটে চল্‌ল।

এম্‌নি ছুটে চল্‌লো—যেন আর একটু এগিয়ে যেতে পার্‌লেই—সে পাবে তার দিদিকে। তিনি যেন অনাথের আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন।

অনাথ অবাক হ'য়ে গেল—কি করে সম্ভব হ'লো গোটা দশটা বছর কাটিয়ে দেয়া—তার দিদিকে না দেখে। জ্ঞান হবার প্রথম দিন থেকে—আজ পর্য্যন্ত আর কারো কথা তার মনে পড়েনা—বাবা মার মুখ তার মনে পড়েনা—কিন্তু এতোকাল অমন দিদিকে ভুলে থাকা কি ক'রে সম্ভব হ'লো? সমিতি আর ব্যব্‌সা—ব্যব্‌সা আর সমিতির মধ্যে ডুবে ছিল সে এতোকাল। কিন্তু আজ? কোথায় গেল ব্যব্‌সা—কোথায় গেল সমিতি—বেঁচে থাক্‌বার কি রইল তার? গেল জীবনের স্বপ্ন—জীবনের অবলম্বন—আর আদর্শ। কিন্তু তার অরুনাদিদি রয়েছেন—রয়েছে তাঁর আশীর্ব্বাদ—রয়েছে তাঁর শুভেচ্ছার জোর—রয়েছে তাঁর ইচ্ছাশক্তি।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ছুটে চল্‌ল অনাথ—মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে এলো—গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে এলো—তাতে নাই তার ক্লান্তি। সন্ধ্যে অতিক্রম ক'রে রাত হয়েছে। অন্ধকার অচেনা গ্রামের পথ—কিন্তু সেদিকে হুঁস্ নেই।

সহরের রাস্তার মোড়েই শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা। শশধরবাবু অনাথকে গাড়ীতে তুলে নিলেন—চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বল্‌লেন, গাড়ী চালাও।

অনাথের বাক্যব্যয়ের শক্তি ছিল না। তাই সে কোন আপত্তি করেনি। দু'জনে চুপ করে গাড়ীর মধ্যে বসে—কোন বাক্য নেই। গাড়ী চল্‌ছে। গাড়ী যখন অরুন্ধতীর বাসার নিকট এল—শশধরবাবু গাড়ী হ'তে মুখ বের ক'রে বল্‌লেন, গাড়ী থামাও—গাড়ী থামাও!

অনাথ—প্রস্তুত ছিল না কাজেই বল্‌ল, আমিতো এখুনি যাচ্ছি—আজ্‌কেই কলকাতা রওনা হোচ্ছি।

সে পরে হ'বে—আজ্‌কে যেতে পার্‌বে না।

না—না—সে হয়না।

আমার সঙ্গে এসো—আর দেরী ক'রোনা।

যন্ত্রচালিতের মতো অনাথ শশধরবাবু সঙ্গে গেলো।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। অরুন্ধতী ভাব্‌ল কাকাবাবু ও অনাথ আর আসবে না। কাজেই সে ভাব্‌তে পারেনি শশধরবাবু সত্যি সত্যি অমন কাণ্ড ক'রে বসবেন। অতো রাতে দু'জনকে দেখে অরুন্ধতী—অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

শশধরবাবু অরুন্ধতীর সে আত্মভোলা ভাব দেখে মনে মনে হাস্‌লো মাত্র। মুখে বল্‌লেন, অনাথের আজ কিছুই খাওয়া হয়নি—ওর খাবার ব্যবস্থা করে দাও।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন।

অনাথ বাধা দিয়ে বল্‌ল, না—না—আমি কিছু খেতে পার্‌বো না—বলেই ইজি চেয়ারটায় শুয়ে পড়্‌ল।

অনাথের গলার স্বর শুনে শশধরবাবু চম্‌কে উঠ্‌লেন—অসুখ করেনি তো! কপালে হাত দিয়ে—মুখ বিকৃতি করে বল্‌লেন, উঃ—জ্বরে গা' পুড়ে যাচ্ছে—তুমি কি করেছো অনাথ—অদ্ভুত তোমাদের স্বভাব। অরুন্ধতী! এখন ডাক্তারদের মধ্যে কাকে পাওয়া যাবে।

অনাথ গোঙ্‌রাতে গোঙ্‌রাতে বল্‌ল, ডাক্তার ডাকা হবে না। অমনি সেরে যাবে—

শশধরবাবু ধমক দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো।

অরুন্ধতী তুমি ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও। আমি ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি বল্‌তে বল্‌তে শশধরবাবু নীচে নামতে লাগলেন।

অরুন্ধতী অতি কষ্টে অনাথকে ধ'রে তার নিজের বিছানায় শোয়ালে—অনাথের কোন হুঁস ছিল না। চোখ বুঝে নির্জীবের মতো পড়ে রইল।

রূপোর-মা বাসায় চলে গেছে। এতো রাতে দারোয়ানকে ডেকে তোলা যাবে না। অরুন্ধতী নীচ থেকে বাল্‌টিতে বাল্‌টিতে জল টেনে অবিরত ঢাল্‌তে লাগল অনাথের মাথায়। অনাথ বেহুঁস—

অরুন্ধতী অনেক রোগীর সেবা করেছে। বিকার গ্রস্থ কলেরা রোগীর শিয়রে একা বসে রাত কাটিয়েছে। কোন দিন ঘাব্‌ড়ায়নি। মরণাপন্ন রোগীকে সেবা কর্‌তে কর্‌তে—সে ভেবেছে—রোগী ভাল হ'বে। কিন্তু আজকে অসম্ভব ঘাব্‌ড়িয়ে গেল। তার মনে হোতে লাগল অনাথ বুঝি আর চোখ মেলে চাইবে না। ভাব্‌তে তার শরীর শিউরে উঠ্‌ল—অনাথ যদি সত্যি না বাঁচে।

অরুন্ধতী অবিশ্রান্ত ধারায় বালটি থেকে জল ঢাল্‌তে লাগল। বালিশ ভিজে গেল—মেঝে জলের প্লাবন ছুট্‌ল—অরুন্ধতীর খেয়াল নেই।

নিস্তব্ধ রাত—অনাথ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। অরুন্ধতী জলধারা বন্ধ করে পাশে এসে বস্‌ল। অনাথের ঐ নিমিলিত চোখের পেছনে ভাগ্যবিধাতা কোন দৃশ্য রচনা ক'রে রেখেছেন —কেউ জানে না। তার জীবনের ভবিষ্যতের মতোই অজ্ঞাত —অন্ধকার! খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকালে—চোখে পড়ে

জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের অমন বীভৎস রূপ অরুন্ধতীর চোখে কোন দিন পড়েনি। বাইরে—ভেতরে—সর্ব্বত্র অন্ধকার। রাত বেড়ে চল্‌ল—বারোটা বাজল—আর অরুন্ধতী একা বসে আছে।

হঠাৎ মোটর লাগার শব্দ হ'ল। শশধরবাবু আর ডাক্তার রায়ের কথা কাণে গেল। অরুন্ধতী মনে মনে বল্‌ল, "সর্ব্বনাশ! ডাক্তার রায় এসেছে।" অরুন্ধতী তাকে ভাল করেই চেনে। এ স্কুলের অনেক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হ'তে—ডাক্তার রায় চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি—অরুন্ধতীর জন্য। জেনে শুনে অমন লোককে কেন তিনি ডেকে এনেছেন—সেটাও বুঝল। অনাথের জন্যে তিনিও ঘাবড়িয়ে গেছেন। কাজেই বিলেত ফেরতা ডাক্তার এনেছেন।

ডাক্তার ঘরে এল। অরুন্ধতী উঠে অভিবাদন করল।

ডাক্তার দু এক মিনিট কাল পরীক্ষা করে বল্‌ল, খুব সাবধানে রাখবেন—ভয় আছে- টাইফয়েডেএ টার্ণ ক'রতে পারে।

বল্‌তে বল্‌তে কলম বের করে খস্ খস্ এক পাতা প্রেসকিপসান লিখে উঠে দাঁড়াল।

আচ্ছা আসি বলে ডাক্তার নমস্কার ক'রে সিড়ি বেয়ে নাবতে লাগল।

বাক্স থেকে টাকা বের ক'রবার সময় পর্য্যন্ত এরা দিতে চায় না—এতো ব্যস্ত। অরুন্ধতী ক্ষিপ্রহস্তে টাকা বের ক'রে দিল—শশধরবাবু পরি-কি-মরি কর্‌তে কর্‌তে মোটরে গিয়ে টাকাটা দিয়ে এলেন। ভিজিট দিতে হ'ল আট টাকা।

ডাক্তার চলে গেল। শশধরবাবু অরুন্ধতীকে বল্‌লেন, তুমি কিছু ভয় পেওনা মা। ডাক্তাররা ওরকম বলেই থাকে। তবে সাবধানে থাকে ভাল। আমি বাড়ী গিয়ে ঔষধটা বেহারীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

ব'লে শশধরবাবু উঠে দাঁড়ালেন—আবার বল্‌লেন, তোমার কাছে যখন এসে পড়েছে—তখন আর কোন ভয় নেই আমার।

তারপর তিনি নীচে নাব্‌তে লাগ্‌লেন—অরুন্ধতী সঙ্গে সঙ্গে আসছিল—শশধরবাবু আপন মনে বলতে লাগলেন, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছে।

অরুন্ধতী ঘরে ফিরে দেখে—রাত একটা। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে—অনাথ চারদিকে চোখ মেলে কাকে যেন ও খুঁজ্‌ছে। অরুন্ধতীকে দেখে বল্‌ল, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

এমন কাতর কণ্ঠস্বর অনাথের গলা থেকে বেরুতে পারে—কেউ কোনদিন কল্পনাও কর্‌তে পারেনি। শশধরবাবুর সঙ্গে তার গাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিল। পাঁচ মিনিটের বেশী হ'বেনা। কিন্তু এরিমধ্যে অনাথ তাকে হারিয়ে ফেলেছিল—অসহায় শিশুর মত চারিদিক চেয়ে খুঁজছিল। অনাথ—অনেকবার অসুখে পড়েছে—ভীষণ অসুখ—সে তুলনায় এটা কিছুই না। কিন্তু নিজেকে অমন অসহায় মনে কর্‌তে কেউ কোনদিন দেখেনি।

অরুন্ধতী শিয়রে বসে অনাথের কপালে—মাথায়—হাত বুলোতে লাগ্‌ল। জ্বরের প্রকোপ অনেকটা ক'মেছে বলে মনে হোল। মনে হ'লো—অনাথ আরামে চোখ বুজে আছে। অরুন্ধতীর বুক থেকে তৃপ্তির নিশ্বাস বেড়িয়ে এল।

রাত বেড়ে চল্‌ল। বেহারী ওষুধ দিয়ে গেছে। সে ওষুধ খাওয়ান হয়ে গেছে। অরুন্ধতী বসে আছে—অনাথের শিয়রে। স্তব্ধ প্রকৃতিকে নিয়ে অন্ধকার রাত্রি ছুটে চলেছে—তার অভিযানে। ঘরে—বাইরে সর্ব্বত্র স্তব্ধতা। বিশ্ব চরাচরে ঘুম নেমে এসেছে—অনাথ ঘুমুচ্ছে—অরুন্ধতী একা বসে জেগে আছে।

(১১)

অনাথের অসুখের খবরটা সাহেবগঞ্জের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো—পরদিন সকালেই। খবরটা পল্লবিত ও মিথ্যের-মসলায় রসাল হোয়ে বেশ উপভোগ্য ও উত্তেজক হ'য়ে ছড়াল—ঘরে ঘরে—চায়ের দোকানে অফিসে—ছাত্র-ছাত্রি মহলে—ক্লাবে—নানা আড্ডায়—আর বড়লোকের মোটা মোটা গিন্নিদের পানের-আড্ডায়। গুজব-রটার মজাই হোচ্ছে এই—যে—পল্লবিত হ'তে হ'তে এতো বেড়ে যায় যে—আসল খবরটা চাপা প'রে বেশ একটা নতুন গল্প মুখে মুখে রচিত হ'তে থাকে। যারা রং ফলাতে জানে—তারা সে গল্পে রং ফলিয়ে আরও জম্‌কালো ক'রে তোলে। গুজবের মধ্যে যদি থাকে রসের গন্ধ—তবে গল্প জমে ভাল—আর প্রচার হয় দ্রুতগতিতে। এমন দ্রুত চলে যে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ প্রচার শিল্পীও তার অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পাল্লা দিতে পারে না। কাজেই অনাথ যে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় অরুন্ধতীর বাড়ীতে রাত কাটিয়েছিল—এ খবর থেকে অসুখের খবরটা খসে গেল—কেবল রইল—অনাথ অরুন্ধতীর বাড়ীতে রাত কাটাতে আরম্ভ ক'রেছে। এ হ'লো আসল খবর—এ আসল খবরের ওপর নানা রং চড়ল।

রঙ্গিন গল্প মুখে মুখে প্রচার হ'লো—যে মদ ঢালাঢালির মাত্রাটা এতো বেশী হয়েছিল—যে শেষটায় ডাক্তার ডাক্‌তে হয়েছিল। দুপুর রাতে মালে টান পড়লে বেহারীকে দিয়ে—ডাক্তারখানা থেকে প্রেস্কিপ্‌সান দেখিয়ে ব্রাণ্ডি আনিয়েছে।

কাজেই এমন রসাল গল্প—বৈচিত্র ভেতো বাঙ্গালী সমাজে কেন চল্‌বেনা? সর্ব্বোপরি রয়েছে নারী মাংসের গন্ধ। অভুক্ত কুকুরের মতো—নারীমাংসের সন্ধানে সারাজীবন ঘুরে বেড়ায়—যে সমাজের অধিকাংশ পুরুষ—সে-সমাজে এমন কাম-গন্ধী গল্প কেন মুখে মুখে প্রচার হ'বেনা? এ-যে ক্ষুধার্ত্ত নিষ্পেষিত কামনার বিকৃত অভিব্যক্তি। যে সমাজের অধিকাংশ পুরুষ নারীকে পায়নি—পেয়েছ নারীর মধ্যে দাসীকে—নগ্ন-কামনার চরিতার্থের জন্য তাকে পেতে চেয়েছে—তারা জানে কামনার ইন্ধন যোগানের জন্যেই নারীর সৃষ্টি হয়েছে। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যেই নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলন—আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কাজেই এ সমাজ ভাব্‌তে পারেনা—ছেলে-মেয়েতে আর কোন সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে। তারা জানে-না—কামনার ইন্ধন জোগান ছাড়া—নারী—জীবনের কোন সহচর হতে পারে। হ'তে পারে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম প্রেরণা—সুখে দুঃখে জীবনের সহচর—জীবনের দুঃখের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার সহায়। স্বয়ং ভগবান এসে যদি—তাদের এ কথা বুঝিয়ে ব'লে—তারা বুঝ্‌বেনা—মান্‌বেনা—দেবতাকে দেবে বিসর্জ্জন। হয়েছেও তাই। জাতি—দেবতাকে দিয়েছে—বিসর্জ্জন। দেবতার প্রাণ পিষে ফেলে—দেবতার আসনে বসিয়েছে—মিথ্যোচার—ব্যাভিচার—আর—আর—প্রাণহীন পূজো-পার্ব্বনের অনুষ্ঠান। দেবতা গেল মরে—অনুষ্ঠান হ'লো প্রধান—মুখ্য।

জাতির মরণ ডাক একদিনে আসে না। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত

পাপের ভারে মাটির সঙ্গে মিশে আছে—যে জনসাধারণ—তাকে বাচাবে কে? কে দূর কর্‌বে এ জঞ্জাল? যুগে যুগে জন্মেছে মহাপুরুষ এ দেশের বুকে—প্রাণপাত করেছে দেশের জনসাধারণকে মানুষের পংক্তিতে টেনে তুল্‌তে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তাদের সকল প্রচেষ্টা—ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রাণপাত পরিশ্রম। সমাজের যে শ্রেষ্ঠ প্রাণশক্তি - নারী—তাকে নির্ব্বাসন দিল পুরুষের দল—দাসীর সমাজে।

সেদিন সন্ধ্যায় শশধরবাবু রওনা হোচ্ছিলেন অরুন্ধতীর বাড়ী! কালকের রাতের জাগরণ আর আহারের অনিয়মে এ বুড়ো বয়সে শরীরটা খুবই কাহিল হয়েছিল। কিন্তু অনাথের খবরটা যেমন ক'রেই নিতেই হবে। সকালেই যাবার ইচ্ছাছিল কিন্তু শত চেষ্টা করেও দুর্ব্বল শরীরটা টেনে তুল্‌তে পার্‌লেনা। লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে জানলেন যে - অনাথ অনেকটা সুস্থ - ভয়ের কিছু নেই—তবে আরোগ্য লাভ ক'র্‌তে সময় লাগ্‌বে।

বাড়ীর গেটে গাড়ী দাঁড়ান—উঠ্‌তে যাবেন। এমন সময় এলো তার বন্ধু-বান্ধব একদল ভদ্রলোক সঙ্গে নিয়ে। শশধরবাবু সহাস্যে তাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন ও বল্‌লেন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক —আস্‌তে আজ্ঞে হোক। আজ্‌কে আমার সুসন্ধ্যা বল্‌তে হ'বে। বিজয়ার পরে সবাইকে একসঙ্গে আর পাইনি—আসুন—আসুন।

হাসিতে নির্জ্জন বাড়ী মাতিয়ে তুল্‌লেন। শশধরবাবু সবাইকে বস্‌বার ঘরে নিয়ে বসালেন। গলা ফাটিয়ে ডাক দিলেন—ওরে বেহারী—তামাক দিয়ে যা—চা দিয়ে যা—বড়ো কেট্‌লিটা চাপিয়ে দে—

তারপর আগন্তুকদের বল্‌লেন, বুঝলেন কিনা এ বাড়ীর আমি গিন্নী - আমিই সব—বলে হেসে ঘর ফাটিয়ে দিলেন।

তামাক এলো—চা এলো—সকলের কুশল প্রশ্নের পালা সাঙ্গ হ'লো। কিন্তু মজ্‌লিস্ যেন জম্‌ছেনা। সবাই মুখ ভার করে দু'এক কথায় জবাব দেন। শশধরবাবুর সমস্ত রসিকতায় কেউ যোগ দেয় না—দু'একজন অতি কষ্টে নেহাৎ ভদ্রতাজ্ঞানে দাঁত বের করে রইলেন মাত্র।

ঘরের এ আব্‌হাওয়ায় শশধরবাবু অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি জীবনে সবাইর চাইতে বেশী ভয় করেন—ঝগড়া-ঝাঁটি। এজন্য ঠক্‌তে হয়েছে তাকে অনেক ক্ষেত্রে। যে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার—তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় এড়িয়ে চল্‌তে চান। এজন্য অনেকে তাকে ভীরু—কাপুরুষ বলেছেন। কিন্তু কি কর্‌বেন তিনি। বাঘের মতো ভয় করেন—সব রকমের মনোমালিন্য। শশধরবাবুর মনে হ'লো—তাকে ঘিরে স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে ক'তগুলো বোমা—সেগুলো এখুনি ফেটে পড়্‌বে। তার ওপর কথার অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হ'বে এখুনি। কতক্ষণ সে অগ্নি বর্ষণ চল্‌বে কিছু ঠিক নেই। মানুষের মুখ-বোমা—মানুষের হাতে তৈরী। বারুদ-বোমার চাইতে ঢের তেজীয়ান—কারণ স্ফুরণ-শক্তি তার অফুরন্ত। মুখ-বোমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথার অগ্নি-প্লাবন বইয়ে দিতে পারে।

শশধরবাবুর ইচ্ছে হ'লো ছুটে পালান। বিশেষ দরকার আছে—কি শরীর খারাপ করেছে—বিশ্বাসযোগ্য কত মিথ্যে কথাই বলা যেতে পারে। দু'একবার চেষ্টাও কর্‌লেন—কিন্তু পার্‌লেন না—অনভ্যস্ত মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা ফুট্‌লনা।

এতগুলো লোক ঘরের মধ্যে বসে আছে—অথচ টুঁশব্দ নেই। শেষটায় শশধরবাবু বল্‌লেন, আমার কাছে আপনাদের বিশেষ কিছু ব'লবার আছে কি? বলেই শশধরবাবু একপ্রকার হাঁপাতে লাগ্‌লেন।

সবাই মুখ-চাওয়াচায়ি কর্‌তে লাগ্‌ল · ভাবটা তুমি বল না—আমি-না। এমনি চললো কয়েক মিনিট। শেষটায় বিমলবাবু কলেজের প্রফেসার বল্‌ল, কেলেঙ্কেরির খবরটা শুনেছেন তো ?

শশধরবাবু বল্‌লেন, কেলেঙ্কেরি ! কার কেলেঙ্কেরি প্রফেসর—

হরিহরবাবু একজন নামজাদা উকিল বল্‌ল, না শোনাটাই স্বাভাবিক—কারণ তাতে—তাতে সুবিধে আছে।

মাধববাবু একজন ক্লার্ক বল্‌ল, ওঁর সুবিধে সব দিক দিয়ে। মাথার চুল সাদা হ'লে অবাধ মেলামেশার সুযোগ—যা হয়—বলে একটু হাসল—

সে হাসিতে সবাই যোগদিল।

শশধরবাবু বেজায় ঘাবড়িয়ে গেলেন তিনি বললেন, কি ব্যাপার আমায় বুঝিয়ে বলুন না ?

একথা শুনে সে-ই প্রফেসরের সঙ্গে সবাই চেচিয়ে উঠল।

পরে প্রফেসার বল্‌ল, জেগে ঘুমোলে কেউ জাগাতে পারে না। কি ব্যাভিচার বলুন দেখি ! বিশেষকরে একজন শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে—যার ওপর রয়েছে আমাদের মেয়েদের গড়ে তোলবার ভার—বিশেষ ক'রে অমন প্রকাশ্যভাবে –

হরিহর কথায় শায় দিয়ে বল্‌ল, হ্যাঁ—ঐটেই বিশেষ আপত্তি কর—প্রকাশ্যভাবে ওরকম ঢলাঢলি—তা না-হ'লে—ই-য়ে—আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের ওসব থাকেই। কি বলেন বিমলবাবু—আপনিতো একজন প্রফেসর।

প্রফেসর বল্‌ল, তা ছাড়া ওকে দেখে মেয়েরা আর যাই শিখুক—অবৈধ প্রেম করার আর্ট—আরও কর্‌তে পারবে।

আর একজন বল্‌ল, বা-বা—কি মেয়ে—পুরুষের সামনে মদ খেয়েছে—মদে চুর্ত্ত।

হরিহর বল্‌ল, চুড় কি—অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল। ডাক্তার সাহেব নিজে দেখে এসেছেন। আর যাই হোক ডাক্তারের সঙ্গে চালাকি চলেনা।

শশধরবাবু নির্ব্বাক চোখের সামনে যদি আগুন জ্বলে উঠ্‌তো তবুও বুঝি অমন অবাক হোতেন না। অরুন্ধতী! কন্যাসম অরুন্ধতীর সম্বন্ধে এ জঘণ্য অভিযোগ! এও কি সম্ভব? অমন মেয়ের সম্বন্ধে কি ক'রে অমন কথা কল্পনা করতে পারলে? মিথ্যে—সম্পূর্ণ মিথ্যে—অদ্ভুত এদের জঘণ্য কল্পনাশক্তি। নারী-পুরুষের আর কোন সম্বন্ধের কথা এরা ভাবতে পারে না! এ অভিযোগ সহ্য করা চলে না—কিছুতেই না। অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়া—আর নিজে অন্যায় করা—একই কথা।

শশধরবাবুকে নীরব দেখে হরিহরবাবু ভাবল তিনি বুঝি অরুন্ধতীর সমস্ত অভিযোগ মেনে নিচ্ছেন। কাজেই উৎসাহ পেয়ে বল্‌ল, অমনই যদি অসহ্য—বিয়ে করে নিলেইতো সব লেঠা চুকে যায়।

আর একজন বল্‌ল, অমন মেয়েকে কে ঘরে নেবে?

তা-ওতো বটে। তা' ঘর না জোটে—বাজার রয়েছে।

সবাই হো হো ক'রে উঠ্‌লে। উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল তাদের মুখ। তারা যেন চোখের সামনে দেখতে পেল—একজন সুন্দরী যুবতীর দেহ ভোগ ক'রবার অধিকার—তাদের সবাইর রয়েছে। তাদের সমস্ত নগ্নকামনা চরিতার্থ করতে পারে—মাত্র দু'চারিটি মুদ্রার বিনিময়ে। অরুন্ধতীর দেহের সমস্ত নগ্নতা উন্মুক্ত করবার ক্ষমতা তাদের-ই হাতের মধ্যে। এ চিন্তায় তারা উল্লোসিত হ'য়ে উঠল। যে কামনা প্রকাশ করতে পারে না সমাজের কঠোর শাসনে—ধর্ম্মের ভয়ে—পরপারের ভয়ে—সে কামনার চরিতার্থতার কল্পনা মাত্রেই—তারা উল্লাসিত হয়ে উঠল। তাদের সে পশু প্রবৃত্তি গা ঝাড়া দিয়ে নেচে উঠল। হাস্‌তে হাস্‌তে একজন বল্‌ল, ঠিক বলেছো ভাই—ঠিক বলেছো।

শশধরবাবু আর সইতে পারলেন না। তিনি ফেটে পড়লেন বল্লেন, অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। আপনারা সবাই—মিথ্যোবাদী—মিথ্যোবাদী—মিথ্যে! মিথ্যে! বল্তে বল্তে তার গলা আটকে গেল।

হঠাৎ এরকম আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। হরিহরবাবু চিৎকার করে বল্ল, বাড়ীতে এসেছি বলে অপমান! আচ্ছা দেখে নেবো—ঢের ঢের দেখেছি আপনার মতো বড়লোক-বক-ধার্ম্মিক সেজে যত সব ব্যাভিচার চালাচ্ছেন।

মুখ সামলে কথা বলবেন--ভদ্রলোক বলে রেহাই পাবেন না—বেহারী—নিকালদাও সব্‌কো!

বল্তে বল্তে শশধরবাবু ঘর থেকে ছুটে বের হ'য়ে গেলেন। চীৎকারে গালিগালাজে—শাসনে—সমস্ত পাড়া মুখরিত ক'রে সবাই চলে গেল।

হৈ চৈ শুনে চারিদিকের বাড়ী থেকে অনেকে ছুটে এলো। বলা বাহুল্য তারাও এ অপবাদে যোগ দিয়ে নানা অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ল। কেউ কেউ সহরের কোথায় কোথায় এ রকম ব্যাভিচার চল্‌ছে—তার বিশ্লেষণ আরম্ভ কর্‌ল। অদ্ভুত তাদের বল্‌বার ভঙ্গি। জঘন্য বিষয়—বিশ্লেষণ কর্‌বার কি তাদের আনন্দ! যেন কোন রসাল জিনিষ চুষে খাচ্ছে। বাড়ীর ছাদে ছাদে—বারান্দায় বারান্দায়—আর জানালার ধারে—মেয়েরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুন্‌ছে—আর হাস্‌ছে। আশ্চর্য্য! একবার তাদের কারো মনে আস্‌ল না—ওরকম হেসে—তারা নিজেদেরই অপমান কর্‌ছে। অথচ এদের অনেকেই কলেজা পড়া মেয়ে—কেউ হাকিমের স্ত্রী—কেউ উকিলের স্ত্রী—কেউ প্রফেসারের স্ত্রী। সত্যিকারের চরিত্রের মানে যে কি—মনে হয় এরা জানে না। এরা জানে না যে—সতীত্বের অভাব যখন হয় সমাজে—তখনই সতীত্ব নিয়ে বাহ্যাড়ম্বের ধুম পড়ে যায়।

লোকজন চলে গেলে শশধরবাবু মরার মতো ইজিচেয়ারটায় পড়ে রইলেন। তাঁর মনে হোচ্ছিল তিনি যেন আর উঠে দাঁড়াতে পার্‌বেন না। স্ত্রী মারা যাবার পর এতো বড়ো আঘাত তিনি পাননি। তিনি ভাব্‌ছিলেন কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি এ দেশের লোকের। মানুষ বাঁচতে পারে—এ সমাজে? মরণাপন্ন রোগীর সেবার মধ্যে—যারা অমন কদর্য্য ধারণা আন্‌তে পারে—আর খোলাখুলি ভাবে—নীচ মনোভাব—অমন উঁচু গলায় প্রকাশ কর্‌তে পারে—তাদের জন্যে—কংগ্রেসের—স্বাধীনতার সংগ্রাম ক'রে কি হ'বে? কি হ'বে সভাসমিতি করে—আর নানা আন্দোলনে দেশ ক্ষুব্ধ করে?

(১২)

পরদিন ভোরে অনাথ মোটামুটি সুস্থ বোধ কর্‌ল। কিন্তু অরুন্ধতী কিছুতেই তাকে বিছানায় উঠে বস্‌তে দিতে চাইল না। অনেক বার বলে-কয়েও যখন অরুন্ধতীকে মানাতে পার্‌ল না, তখন অনুপায় হয়ে অনাথ গুম্‌ হয়ে বিছানায় পড়ে রইল—চুপ্‌ চাপ্‌। অনাথ ভাব্‌ল—এ সব অরুন্ধতীর বাড়াবাড়ি—যা অল্পবিস্তর সব মেয়েরি থাকে। কিন্তু এতোটা মেয়েলি-পনা অরুন্ধতীর মধ্যে সে কখনও দেখনি। বিপদ—আপদে—অনেকদিন তারা দু'জনায় একসঙ্গে কাটিয়েছে—কিন্তু কই এমন বাড়াবাড়িতো কোনদিন লক্ষ্য ক'রেনি। আজকের অরুন্ধতী যেন তার পরিচিতা অরুন্ধতী নয়—যেন আর কেউ। একে তার আজও জানা হয়নি—বোঝা হয়নি। অনাথ কেবলি ভাব্‌তে লাগ্‌ল এমন কি ঘটনার অবতারণা হ'তে পারে—যা অরুন্ধতীর মধ্যে এনে দিতে পারে—এমন পরিবর্ত্তন। যেন গোটা মানুষটাকেই বদ্‌লিয়ে দিয়েছে। তার চোখের ছবিতে—কণ্ঠস্বরে—কথা বলার ভঙ্গিতে—দাঁড়াবার ছন্দে—পরিচিতা অরুন্ধতীকে দেখা যায় না। সমস্ত শরীরে আর কেউ এসে আশ্রয় নিয়েছে।

অনাথ একবার বল্‌ল, কি হয়েছে তোমার অরুন্ধতী ?

কই না তো বলে অরুন্ধতী ব্যস্ত হয়ে পড়ে—কোন একটা কিছু করার ছুতায়।

সত্যি ক'রে বলো—কি হয়েছে তোমার ?

আমি কি কোনদিন কিছুলুকিয়েছি তোমার কাছে।

সে জন্যেই তো জিজ্ঞেস কর্‌তে সাহস পাচ্ছি।

তাই যদি হয়—তবে বিশ্বাস করো—আমার কথা—

এ জবাবের পর অনাথ চুপ কর্‌তে বাধ্য হ'লো। অনাথ চুপ করে পড়ে রইল—মিছামিছি বিছানায় পড়ে থাকা অনাথের কাছে শাস্তি বিশেষ।

এমন সময় অরুন্ধতী এসে একটা চেয়ারে ব'সে তার কপালে হাতখানা রাখল। তারপর বল্‌ল, না—জ্বর বেশী নেই। বিকেলের দিকে ছেড়ে যাবে। অরুন্ধতী হাত তুলে নিল।

এর্মনি কাট্‌ল অনেকক্ষণ। অরুন্ধতী আবার আস্তে আস্তে বল্‌ল, বিকেলের দিকে জ্বর সেরে যাবে মনে হোচ্ছে।

অনাথ বল্‌ল, তাহলে আমি আজ বিকেলেই রওনা হবো।

অরুন্ধতী হেসে বল্‌ল, বেশ যেও—

ঠাট্টা নয়—সত্যিই আমি যাবো—আমায় যেতেই হবে।

যেতে হ'বে মানে ? বল্‌লেই হোল—আমার কথার কি কোন মূল্য নেই ?

অরুন্ধতী উঠে চলে যাচ্ছিল—অনাথ ডেকে বল্‌ল, শোন অনেক কথা আছে—

অরুন্ধতী ফিরে দাঁড়াল— বস্‌ল না—বল্‌ল, বলো কি বল্‌বার আছে ?

ব'সো।

না—বোস্‌বার সময় নেই, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে—

বেশ তাহলে কাজ সেরে আসো।

সেখান হ'তে উঠে, অরুন্ধতী ঘরের চারিদিকে একবার তাকাল। নানা ত্রুটী চোখে পড়লো—যা কোনদিন সহ্য করেনি—কিন্তু আজ নড়্‌তে ইচ্ছা করে না। টেবিল চেয়ারে ধূলো জমেছে—আলনায় রাজ্যের ময়লা কাপড়—মেঝেতে পড়ে আছে খবরের কাগজ—তাক থেকে দু'টো বই মেঝেতে পড়ে আছে—জলের কুজোর ডাক্‌না খোলা পড়ে আছে।

অরুন্ধতী চেয়ে চেয়ে সব দেখ্‌ছে—হঠাৎ ঠিক করল সে স্কুলে যাবে না—ছুটি নেবে। হাঁ, ছুটি নেবে— বেশ কয়েকদিনের জন্যে। অম্‌নি টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে খস্‌ খস্‌ ক'রে লিখ্‌ল ছুটির দরখাস্ত। দরোয়ানকে ডেকে সে-টা পাঠিয়ে দিল সেক্রেটারীর কাছে।

অরুন্ধতী সেক্রেটরীর কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে চলে এলো অনাথের কাছে। না এসে পারল না। চেয়ারে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল, আজকে আমার একটা কথা বড়ো বিশ্রী মনে হচ্ছে। অবশ্য নতুন কথা তেমন কিছু নয়। সময় চ'লে যেতে লাগল, তখনও যখন অরুন্ধতী আর কোন কথা বলে না—তখন অনাথ বল'ল, কি থাম্‌লে যে—বলোনা?

ভাব্‌ছিলাম—আমাদের দেশে সমাজ গড়ে উঠেছে কেবল পুরুষদের সুযোগ সুবিধের ওপর। এই দেখোনা সেদিনের ব্যাপারটা। তুমি যে একটা রাত এখানে কাটালে—এরি মধ্যে সমাজ কত হীণ অর্থ বের ক'রতে পা'রল।

কই আমিতো এদিক দিয়ে ভাবিনি। এতে যে দোষ হ'তে পারে—তাতো আমার মনে আসেনি।

তাতো আস্‌বেইনা, তোমরা যে পুরুষ—এ সমাজে পুরুষের কোন দোষ হ'তে পারেনা।

ভুল বুঝ্‌লে অরুন্ধতী! এ সব তোমাদেরই মনের দুর্ব্বলতা গড়া—বাঁধা-বিঘ্ন। দুর্ব্বলতা ছেড়ে মন শক্ত ক'রে বিদ্রোহ করো দেখি—কোথায় যাবে সমাজের বাধাবিঘ্ন—পথ আপ্‌নি মুক্ত হ'য়ে যাবে। তবে একটা কথা ভাব্‌তে হবে—সে হোচ্ছে নিজেকে খাঁটি রাখ্‌তে হ'বে। বিদ্রোহ করা মানে—অসংযম নয়।

বল্‌লেতো বিদ্রোহ ক'রো। কতো মেয়েই তা করেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি কি হয়েছে তাতে? ভাল চোখে কেউ তাদের দেখেনি। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিজাল তাদের পথ আট্‌কিয়ে ধরেছে। তাদের আবার ঘরের কোণে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে—বাধ্য ক'রেছে তাদের কুলবধূদের—যত সব বাজে নিয়ম কানুন মাথাপেতে নিতে।

অনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বল্‌ল, দেশের অধঃপতন কি এম্‌নি হয়েছে? বহুলোকের পাপের বোঝা নিয়ে এ-দেশ চাপা পড়েছে। এদেশের জনসাধারণের মনোবৃত্তিতে আমি মাত্র দু'টো ভাবের অভিব্যক্তিই দেখ্‌তে পাই—একটা হোচ্ছে পৈশাচিক অর্থ-পিপাসা—আর একটা পৈশাচিক কামপ্রবৃত্তি। এই দু'ই প্রবৃত্তির আধিক্যে চাপা পড়ে গেছে—আর সব মানুষোচিত প্রবৃত্তি। মনে হয় কি জান? মনে হয়—মানুষের দেহে ক'তগুলো পিশাচ ঘুড়ে বেড়াছে—দেশের সর্ব্বত্র—তাদের নগ্ন-কামনা চরিতার্থের জন্য!

এমন সময় মড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজলো। অরুন্ধতী উঠে দাঁড়াল ও বল্‌ল, ঐ যা, ওষুধ খাওয়ার সময় গেল পেড়িয়ে। তুমি যখন বক্তৃতা আরম্ভ ক'রো—তোমার খেয়ালই থাকে না।

অনাথ বল্‌ল, যাক্—আমার বক্তৃতা আর বেশীক্ষণ শুনতে হ'বেনা। আমি আজ সন্ধ্যের ট্রেনে রওনা হবো।

ইস্! বল্‌লেই হলো—আজ যাবেন তিনি। শরীরের কি হাল হয়েছে চেয়ে দেখ দেখি!

না—না আমার যেতেই হ'বে।

কোথায় যাবে? কি এমন তোমার কাজ যা—অসুখ শরীর নিয়েও কর্‌তে হ'বে?

কোন কাজ নেই—সব কাজ ছেড়ে দিয়েছি—তবু যেতে হবে।

একটু থেমে আবার বল্‌ল, আজকের দিনে দিদির সঙ্গে দেখা করাই বড়ো কাজ—আর কিছু মাথায় আসেনা।

অরুন্ধতী চুপ ক'রে রইল। অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারলো না। পরে অনাথের শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল, আচ্ছা—তোমার দিদির কথা একদিনও তুমি ব'লনি। অনেক দিন তোমায় জিজ্ঞেস করেছি—কিছু বলোনি—কেবল ভারালেই।

অনাথের দৃষ্টি তখন সে ঘর ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে। অরুন্ধতীর কথা যেন শুন্‌তেই পায়নি এমনি ভাবে চুপ করে প'ড়ে রইল। অনাথকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে অরুন্ধতী তাকে একটা ঝাকানি দিয়ে আবদারের সুরে বল্‌ল, না আজ তোমায় বল্‌তেই হবে—আজ কে ছাড়ছি নে।

অনাথ বল্‌ল, দিদির কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে গেলেও তার পরিচয় শেষ করা যায় না। আজকে আমি বল্‌তে—আমি পার্‌বোনা—সময় কই?

অরুন্ধতী চটে গেল। বল্‌ল, সময় কই মানে—

আজ্‌কে সন্ধ্যের গাড়ী তে—

অরুন্ধতী এবার বেজায় চটে গেল। বল্‌ল, দেখ—বেশী বাড়াবাড়ি ভাল না। বল্‌ছি যেতে পার্‌বেনা - তবুও কথা যেন কাণ দিয়ে যেন যায় না। পাগলামি ক'রোনা---আজকে যেতে পারবে না।

অনাথ বুঝ্‌তে পার্‌লো অরুন্ধতীকে স্বীকার না করে আর তার উপায় নেই।

সে জানাতো-না পুরুষের ওপর যত বড়ো আহ্বানই আসুক—চিরন্তন নারীর ডাক—সব-এর ওপর। অরুন্ধতীর নির্দ্দেশ শুধু হুকুম নয়—অরুতীর মধ্যে—যে—চিরন্তন নারী রয়েছে—তার পরিচয়।

দু'জনায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। হঠাৎ অনাথ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে বল্‌ল, তবে—তবে আমার কি রইল—কি নিয়ে বাঁচবো? ভেঙ্গেছে সমিতি—লোস্‌কান দিয়েছি ব্যবসায়। ভেবেছিলুম দিদিকে খোঁজার যাত্রা পথে—জীবন শেষ করে দেবো। তাঁর আশীর্ব্বাদ পাবার আশায় আমি চলবো—দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—যেদিকে এ দু'চোখ যায়। আমি চল্‌বো। আমার জীবনে কোন বন্ধন নেই—আশা নেই—নেই আকাঙ্ক্ষা—নেই আদর্শ—ভেঙ্গেছে সব।

বল্‌তে বল্‌তে অনাথ হাঁপাতে লাগল। সুস্থ হ'লে অরুন্ধতী ধীরে ধীরে বল্‌ল, একথা তোমার মুখদিয়ে মানায় না—অনাথ। জীবনের পরাজয় তুমি নিজে ডেকে আনছো। যে সম্পদ তোমার রয়েছে—তার কাছে আজকের এ ক্ষতি অতি তুচ্ছ। এর চাইতে অনেক বড়ো আঘাত তুমি সহ্য ক'রেছে—আক্ষেপ করোনি কোনদিন। ব্যবসায় তুমি বার বার লোসকান দিয়েছো। কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে সে লোসকান তুলে নিয়েছো। কোনদিন জীবনের ব্যর্থতাকে স্বীকার করোনি। বল্‌ছো—সমিতি ভেঙ্গেছে—তা' ভাঙ্গুক। তাই বলে কি তোমার

—মন ভেঙ্গে পরবে? কেন ভেঙ্গে যাবে তোমার জীবনের স্বপ্ন—জীবনের আদর্শ। দেশের স্বাধীনতা আনবার পথ শুধু দুটো একটাই নয়। গুপ্ত সমিতি আর কংগ্রেস ছাড়াও অনেক পথ আছে।

তুমি এসব কথা বিশ্বাস করো—মন প্রাণে বিশ্বাস করো।

নিশ্চয় করি। আমি দেখ্‌ছি অসংখ্য কাজ পড়ে আছে—এই অধঃপতিত জাতিকে তুলে ওঠাবার জন্যে। অসংখ্য কাজ পড়ে রয়েছে। এ'দের নেই শিক্ষা—নেই অর্থ—নেই সামর্থ্য—নেই মনোবল।

সে-জন্যই তো সমিতির কাজ।

না—গুপ্তসমিতিতে আর যেতে পারবে না। ও হ'বে পশ্চিমের পানে তাকিয়ে—সূর্য্যোদয় দেখবার বৃথা চেষ্টা। সে চেষ্টা নষ্ট হ'লো বলেই কি—জীবনে আর কিছু ক'রবার নেই। এটা তুমি জেনো—যে সূতে দিয়েই মালা তৈরী করো—দুর্ব্বল অংশ থাকলে গোটা মালাটাই দুর্ব্বল হয়ে যাবে। সে ছিদ্র পথে সব ফুল ঝরে পড়ে যাবে—তোমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। জাতিকে সমর্থ করতে হ'লে সবদিক দিয়েই সমর্থ করতে হ'বে। তাকে সমর্থ করতে হ'বে অর্থে—সমর্থ করতে হবে জ্ঞানে—সমর্থ করতে হবে আত্ম-বিশ্বাসে। তবেই ত বিপ্লববাদ হ'বে সার্থক।

অরুন্ধতী কথাগুলো একটানা বক্তৃতার সুরে ব'লে গেল। অনাথ অবাক হয়ে শুন্‌ছিল। বিশেষ বড়ো কথা সে বলেনি। কিন্তু বলার মধ্যে ছিল জোর—বিশ্বাসের জোর। সে বিশ্বাস আসে অনুভূতি থেকে। পাণ্ডিত্বের জাহির—মানুষের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় কিন্তু কায়মনে বিশ্বাস আনা যায় না। অরুন্ধতী

অনাথকে যা বললো—তা' নতুন কিছু নয়। কিন্তু সে মুহূর্ত্তে অনাথের কাছে সব কথা নতুন ঠেক্‌ল। তার মনে হলো - ও সব কথা যেন সে জীবনে শোনেনি। যে পথের সন্ধান অরুন্ধতী দিল—তার খবর সে কোনদিন রাখেনি। হয়তো সে পথ—অনাথ বার বার অতিক্রম করেছে—কিন্তু চোখ খুলে দেখেনি। আজ অরুন্ধতী তার চোখ খুলে দিল——পথের সন্ধান দিল। মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—জীবনের এ অন্ধকারে—অরুন্ধতীই তাকে পথ দেখিয়ে দিল। চোখ বুজে পড়ে রইল।

অরুন্ধতী অনাথের মাথাধরে একটা ঝাকানি দিয়ে তুলে বল্‌ল, না—অমন ক'রে চোখ বুজে তুমি পড়ে থাকতে পারবে না। কথা বলো যা খুসি বলো।

অনাথ হেসে বল্‌ল, বেশী কথা বলা তোমার নিষেধ রয়েছে।

ইস্! আমার সব কথাই যেন তুমি শোন—

শুনিনা। এই যে বিছানায় পড়ে রয়েছি—অনর্থক ওষুধ গিল্‌ছি—দিদির কাছে যেতে দিলে না—এ সব কি হ'লো?

অরুন্ধতী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বল্‌ল, তা'হলে যাবেনা বলো?—কেমন—কেমন জব্দ?

আমার আর কি? আরামে কাট্‌বে ক'দিন—কিন্তু ঘায়েল হ'বে তুমি।

শুধু আরাম? আর কিছু পেলে না?

অনাথ অবাক হয়ে অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, আর—আর কিছু তো ভাবিনি।

তা ভাববে কেন? এসেছিলে তো হাল-ভাঙ্গা পাল-ছেঁড়া নৌকোর মতো—জীবনের আদর্শ—জীবনের ধর্ম্ম—জীবনের স্বপ্ন—সব ভেঙ্গে চুড়ে।

অনাথ চোখ বুজে চুপ করে রইল।

অরুন্ধতী অনাথের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর—পরে ওষুধ খাবে। ভেবোনা—সব ঠিক হয়ে যাবে—

বিকেলে অনাথের সর্ব্ব শরীর কম্পদিয়ে আবার জ্বর এলো। বিছানার পাশে একখানা ইজিচেয়ার টেনে অরুন্ধতী বিশ্রেম কর্‌তে কর্‌তে ঝিমিয়ে পড়েছিল। অনাথ রসিকতা ক'রে বল্‌ল, আবার যে আস্‌ছেন—

অরুন্ধতীর তন্দ্রা কেটে গেল—ধর্‌ফর্‌ ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল। বল্‌ল, কই—কে আসছেন?

অনাথ নিজের কপাল দেখিয়ে দিয়ে বল্‌ল, এই যে—এখানে।

অরুন্ধতী কপালে হাতদিয়ে দেখে সে-দিনের মত জ্বর! মুহূর্ত্তে তার মুখের ভাব মিলিয়ে—ফুটে উঠ্‌ল আতঙ্ক।

ওমা! অসুখ নিয়ে আবার ঠাট্টা!

তোমাদের কাণ্ড দেখে ঠাট্টা না ক'রে উপায় আছে? সে দিন রাতে সামান্য জ্বর নিয়ে—কি মাতামাতিই না করলে—তুমি আর কাকাবাবু—

সামান্য জ্বর বলছো! এর-নাম সামান্য? জ্বরে বেহুঁস্‌ হ'য়ে পড়েছিলে—ইস কি ভয়-ইনা হয়েছিল!

আর আজকে ভয় করছেনা?

কেন করবে না। সত্যি আমার বড্ড ভয় হচ্ছে—ডাক্তারের ওষুধ মোটেই ধরেনি।

একথা শুনে অনাথ হেসে উঠল। বল্‌ল, ডাক্তারের ওষুধ খেলে-তো ধ'রবে—

তুমি তা'হলে ওষুধ খাও-না! আমি নিজে ওষুধ খাইয়ে দি যে?

হ্যাঁ—তুমি মুখে ঢেলে দাও—আর আমি—জানালা দিয়ে ফেলে দি।

এ সব করার মানে?

মানে—এই—ঐ সব ছাইভস্ম খাবার কোন প্রয়োজন নেই।

বটে! কি ক'রে জান্‌লে প্রয়োজন নেই—খুব যে ডাক্তার হোয়েছো।

তা' যে জানোয়ারটাকে ডেকেছিলে—তার চাইতে ভাল ডাক্তারি জানি। সে অবস্থায়ে আমারও হাসি পেয়েছিল—আর এক মিনিট থাকলে আমি হেসেই ফেলতাম। কিনা বোল্‌ছিল—টাইফয়েডএ টার্ণ করতে পারে—টায়ফয়েড হো হো হো

অরুন্ধতী অবাক! বল্‌ল আর যাই হোক—অসুখটা অমন হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ডাক্তারের ভুল হতে পারে—তাই বলে তার ব্যবস্থা দেখে হেসে লুটোপুটি খাবার কিছু নেই।

অরুন্ধতীকে অমন অবাক হ'তে দেখে অনাথ আরও হাসতে লাগল। অনাথকে অমন ক'রে হাসতে দেখে—অরুন্ধতী ভাবল জ্বরের প্রকোপেই বুঝি ওরকম ক'রছে।

অরুন্ধতী বেজায় ঘাবড়িয়ে গেল। তাকে আর ঠেকান যায় না—ব্যাপারটা ভেঙ্গে বলা উচিত।

তাই বল্‌ল, কিছুদিন থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছি। মাঝে মাঝে ওরকম কম্পদিয়ে জ্বর আসে। অনিয়ম—অত্যাচারটা কিছুদিন থেকে বেড়েছে—তাই জ্বর হোল।

ম্যালেরিয়া! ম্যালেরিয়ায় মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে?"

অজ্ঞান হবার কারণ অন্য ব্যাপার। সেদিন না খেয়ে মাইল চল্লিশ হেটেছিলাম।

না খেয়ে চল্লিশ মাইল হেটেছিলে? কেন—অমনকাজ ক'রেছিলে?

সে-দিন উন্মাদের মতো হাট্‌তে হাট্‌তে অনেকদূর চ'লে গিয়েছিলাম—গ্রামের পর গ্রাম। কোন কাজ ছিল না—এমনি সময় কাটিয়ে দেয়া।

গোটাজীবনটাই যখন নিরর্থক হয়ে যায়—তখন জীবনের খণ্ড অংশগুলোর প্রতি—আর দরদ থাকে কেন ?

অরুন্ধতী এতক্ষণ চুপ করে সমস্ত শুনছিল। এবার বল্‌ল, বুঝতে পেরেছি নিজের দোষে এ অসুখ ডেকে এনেছো। এখন থেকে ও-সব হেয়ালি ছাড়—শরীরটা ভাল ক'রতেই হবে তোমার। এ দেহ—এ জীবন অপচয় করবার কোন অধিকার নেই—তোমার। বিধাতার দেওয়া আলো বাতাসে পুষ্ট—এ দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার—কোন অধিকার নেই। দেশের কাছে—সমাজের কাছে তুমি জবাবদিহি—।

আমার শরীরটা পোষ্টাই করার ভার-যে তোমরাই নিয়েছ অরুন্ধতী। এ ক'দিনে ক'সের 'ভিটামন' আমার শরীরে ঢুকিয়েছ বলতে পার ? এমনি ক'রে আর ক'দিন যদি চলে—তবে বহুদিন আর কিছু না খেলেও চলবে। যে খাদ্য প্রাণ মজুত থাকবে—তা খরচ হ'তে সময় লাগবে। ছাগলের দুধ খেয়েছি একঘণ্টা হ'লো—এখন কি দেবে। ভিটামিন এ, বি সি—কি আছে নিয়ে এস—

অরুন্ধতী গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ল, রাগ ক'রো কেন ?

অরুন্ধতী বাইরে এসে দেখে—শরতের বেলা শেষের সোনালী রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—তার ঘরে—বাগানে—বারান্দায় —দূরের ঐ মাঠের গাছের পাতায়। জীবনে এমন ক'তো গোধূলি লগ্ন এসে—তার অজ্ঞাতে চলে গেছে। এ'তে যে এতো মোহ রয়েছে—তা' সে কোনদিন জান্‌তে পারেনি। অরুন্ধতী ভাব্‌লো —আজকের এ সন্ধ্যার সিন্দুর শরতের—না তার অন্তরের।

কিছুক্ষণ পর নিয়ে এলো চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের পট সাম্‌নে রেখে সাম্‌নাসাম্‌নি হয়ে বস্‌ল অনাথ—আর অরুন্ধতী।

দ্বিতীয় কাপ চা ঢেলে নিতে নিতে অনাথ বল্‌ল আমার বোধহয় শিগ্‌গির যাওয়া হবে না—অরুন্ধতী।

অরুন্ধতী কি জানি বল্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দিল সেক্রেটারীবাবু এসেছেন।

অনাথ অবাক হয়ে বল্‌ল, সেক্রেটারী—সে এখানে কেন?

দারোয়ান চলে গেলে অরুন্ধতী বল্‌ল, এ বুড়ো সেক্রেটারী আমার জীবন দুর্ব্বহ করে তুলেছে—যাই দেখে আসি।

অনাথ হেসে বল্‌ল, কি রকম?

কি রকম আর কি—

বল্‌তে বল্‌তে অরুন্ধতী নীচে নেমে গেল।

অরুন্ধতী সেক্রেটারীকে বল্‌ল, কি মনে করে—এ অসময়ে।

অসময়ে? তা'

না—না—সে কথা হোচ্ছেনা—কি দর্‌কার বলুন তো?

দর্‌কার? হ্যাঁ, বিশেষ দর্‌কার—

সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বরে অরুন্ধতী চম্‌কে উঠলো।

সেক্রেটারী আবার বল্‌ল, বিশেষ দরকার বলেই আপনার কাছে নিজে আস্‌তে বাধ্য হয়েছি—তা না হ'লে ডেকে পাঠাতাম।

অনর্থক সময়ে অসময়ে আসেন কিনা—এ জন্যেই জান্‌তে চেয়েছিলাম সত্যি কোন কাজে এসেছেন—না এম্‌নি—

সেক্রেটারী বেজায় চটে, চিৎকার করে বল্‌ল, না—

না মানে!

মানে আর কি—বিশেষ দরকারে এসেছি—

বেশ তো—বলুন না কি কাজ—

আমি জান্‌তে চাই—অনাথ বাবু এ বাড়ীতে আর ক'দিন থাক্‌বেন?

সেটা আপনার প্রয়োজন ?

বিশেষ প্রয়োজন—বলুন—তিনি এখান থেকে যাবেন কিনা ?

যদি বলি তিনি এখান থেকে যাবেন না—যতদিন খুশি—থাক্‌বেন—

তা-হ'লে আমিও বলবো তিনি এখানে থাক্‌তে পারবে না—তাকে আজকেই—এই মুহূর্ত্তে বের করে দিতে হবে।

চমৎকার আবদার তো—আমার বাড়ী থেকে—আমার অতিথিকে বের ক'রে দেবেন ? জুলুম মন্দ নয়।

হ্যাঁ। প্রয়োজন হ'লে এর চাইতে অনেক বেশী কিছু কর্‌তে হ'বে—

প্রয়োজন ! অনাথ বাবুকে বের করে দেয়া প্রয়োজন ? কিসের প্রয়োজন ? কার—?

স্কুলের মঙ্গলের জন্যে—আর স্কুলের ছাত্রিদের—ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ব্যাভিচার—! কি ব্যাভিচার দেখেছেন ?

আপনারা দু'জনায় যা দেখাচ্ছেন তাই দেখছি—লুকিয়ে চুরিয়ে তো কিছু হোচ্ছে না—সবই প্রকাশ্য ভাবে কর্‌ছেন। অদ্ভুত আপনাদের সাহস। লোকলজ্জার ভয়—না হয় নাই রইল—কিন্তু এতো সাহস ভাল নয়।

সে কথা বরঞ্চ আপনার বেলায় খাঁটে।

আমায় বেলায় খাটে !

হ্যাঁ। আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আপনার মাথা খারাপ—আপনি এখান থেকে যান এখন। কি স্পর্দ্ধা—একজন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অমন জঘন্য ইঙ্গিত ক'রতে সাহস পেলেন ? একেই বলে টাকার গরম—মূর্খের হাতে টাকা পড়লে বর্ব্বরতা বেড়েই যায়। আপনি তার প্রমাণ—

ব'লে অরুন্ধতী হাঁপাতে লাগল।

অমন কড়া কথা অরুন্ধতী বল্‌তে পারে সেক্রেটারী ভাবতে পারেনি। কথা শুনাতে এসে—নিজেকেই কথা শুন্‌তে হলো। একটু দমেও গেল। বল্‌ল, দেখুন গুরুমা আপনি ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন—আমরা আর কি বলবো—সহরের সবাই বল্‌ছে।

সবাই মানে—আপনার মতো লোক তো—তাদের জুতো লাগালেন না কেন?

ক'জনকে জুতো লাগাবো—বদনামে সহর ছেয়ে গেছে—

লোক লাগিয়ে তাদের সবাইকে জুতো লাগান গে—যান এখন আপনি।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন—আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?

জানি একটা মূর্খ—বর্ব্বর—আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছে!

ভুলে যাবেন না—সে বর্ব্বরের হাতের মুঠোয় আপনি—আপ্‌নি তার চাকর।

বটে—চাকুরির ভয় দেখাচ্ছেন—এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি আপনার চাকরি। দাঁড়ান—রেজিগ্‌নেশন লেটার লিখে আন্‌ছি চাকরির ভয় দেখাতে এসেছেন—

অরুন্ধতি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো! সে যে চাকরি ছেড়ে দেবে সেক্রেটারী ভাবতে পারেনি। সেক্রেটারী এসেছিল একটু শাসাতে: কিন্তু ব্যাপার ঘটল বিপরীত। নিজেই ঘায়েল হ'ল। কারণ অরুন্ধতীর মতো শিক্ষয়িত্রী সহজে মেলে না—সে চলে গেলে স্কুলের তাল সামলান সেক্রেটারীর কর্ম্ম নয়। বিব্রত হয়ে কিছুক্ষণ একলা ঘরে বসে রইল। এমন সময় দরোয়ান দিয়ে গেল অরুন্ধতীর 'রেজিগ্‌নেসন লেটার'।

সেক্রেটারী যখন বেরিয়ে গেল—তখন তার মুখের দিকে চাইলে বোঝা যেতো যে –সে যেন পরাজিত হয়েই ফির্‌ছে। শাসন করতে এসে নিজেই শাসিত হয়েছে।

আধঘণ্টা পর অরুন্ধতী যখন অনাথের কাছে ফিরে এল কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে—একটু হেসে বল্‌ল, ভালই হ'লো।

অনাথ বল্‌ল, আমারও কোন কর্ম্ম নেই, তোমারও রইল না —বেশ মজা—না?

সব শুনেছো দেখছি—

শোনবারমতো ক'রে বল্‌লে—না শুনে উপায় আছে?

কাণে আঙ্গুলদিয়ে বসে রইলেনা কেন?

সেটা কর্‌লে জীবনের মস্তবড়ো একটা আনন্দ হতে বঞ্চিত হতাম।

আনন্দ! ঝগড়া শুন্‌তে তুমি আনন্দ পাও।

অনেক সময় পাওয়া যায়—বিশেষ ক'রে তুমি যখন ক্ষেপে যাও।

বটে!

হ্যাঁ –

আর এক পট চা দিতে দিতে অনাথ বল্‌ল, এ'গুলো ঠাণ্ডাহয়ে গেছে। গরম কথা শুন্‌তে শুন্‌তে—গরম চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

অরুন্ধতী আবার জল আনতে চলে গেল। অপূর্ব্ব এ'দের মনোবল। জীবনের সকল দুঃখকে নির্ব্বিকার সন্ন্যাসীর মতো হেসে উড়িয়ে দিতে—এমনি অভ্যস্ত—যে কালকের গ্রাসাচ্ছাদনের দুশ্চিন্তায়—তা'দের আজকের আনন্দ মাটি হ'তে পারে না। দু'জনাই নিঃসম্বল—একমাত্র সম্বল মনের বল। অভিনব জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে যাবার জন্য যেন তারা প্রস্তুত। এতো শিগ্‌গির প্রস্তুত হ'লো—যেন সবকিছুই ঠিক ছিল। অনাথের ব্যবসায় লোসকান

আর অরুন্ধতীর চাকরী যাওয়া-এসব যেন ঠিক ছিল। একদিন কেবল—নির্দ্ধারিত দিনের অপেক্ষায় বসেছিল।

কাজেই কিছুক্ষণ পর, খবর পেয়ে শশধরবাবু নিজেই রাত্রেই ছুটে এলেন। যখন দেখলেন ওরা দু'জন গল্পগুজবে মসগুল হয়ে চা' খাচ্ছে—তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মনে মনে বল্‌লেন—ভগবান এদের সুখী ক'রো—এদের জীবন ব্যর্থ ক'রোনা।

কিছুই যেন হয়নি এমনি স্বাভাবিক ভাবে অরুন্ধতী শশধরবাবুকে অভ্যর্থনা করল। লোকনিন্দা—অর্থকষ্ট—অনাহার—কিছুই অরুন্ধতীকে স্পর্শ করে নাই। কোন উপাদানে গড়া এ মেয়ের দেহ-মন তা একমাত্র বিধাতা পুরুষই জানেন।

অরুন্ধতী বল্‌ল, কাল কেন আসেন নি—কাকাবাবু—আমার যা রাগ হয়েছিল—আপনার ওপর

অনাথ বল্‌ল, হ্যাঁ—সামনে পেলে আর রক্ষে ছিল না। ঠিক ঐ সেক্রেটারির অবস্থা হ'তো—বলে অনাথ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

সে হাসিতে অরুন্ধতীও যোগ দিল। কিন্তু হাসতে পারল না। শশধরবাবু অবাক হয়ে তাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শশধরবাবু বল্‌লেন, তারপর—এখন কি করবে ঠিক করেছো—অরুন্ধতী ?

অনাথ বল্‌ল, আমাদের সব ঠিক হয়ে আছে।

শশধরবাবু বল্‌লেন, ঠিক হয়ে আছে! কি ঠিক করলে এরি মধ্যে ?

খাবো—দাবো- আর হাসবো।

অনাথের কথা শুনে অতি দুঃখেও শশধরবাবুর হাসি পেল। তিনি বল্‌লেন, বেশ-ত যদি পার—উত্তম। কিন্তু পারবে কি ?

না পেরে উপায় নেই—

অনাথের কথা শুনে শশধরবাবু চুপ করে বসে রইলেন—কি জানি ব'লতেও চেষ্টা করলেন একবার।

অরুন্ধতী বল্‌ল, কি বলেন কাকাবাবু—জীবনের যে ক'টা বছর বাকী আছে—হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া উচিত নয় কি ?.

শশধরবাবু এদের কথার মধ্যে কোন খেই পেলেন না। অরুন্ধতীকে কাছে ডেকে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, মা—ওদের ক্ষমা করো। ওরা যা' করেছে—সেজন্য একমাত্র ক্ষমাই উপযুক্ত। রাগ কর্‌বারও অনুপযুক্ত।

শুধু দেহের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে—যে জাতি—সব শক্তি খরচ ক'রে ফেলে—তাদের মনোরাজ্যে কল্পনার স্থান কোথায়? প্রতিদিনকার দেহের ক্ষুধা—পিষে মেরে ফেলে—যাদের কল্পনার ক্ষুদ্রতম অঙ্কুর—তাদের পরিস্থিতি কি হ'তে পারে ? সমস্ত জাতির ইতিহাসেই এ বিপর্য্যয় দেখা যায়। তবু তারা উঠতে চেষ্টা করে—মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—পেরেছেও—পারবেই। যুগ যুগ ধ'রে এই নিয়ম চলে আসছে। উত্থান পতন সকল জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়। হিমাচলের মত কোন জাতি স্থিরভাবে আছে? তবু তাদের—কল্পনা থেকে—রাজ্যচ্যুত হ'তে দেখা যায় না। কিন্তু ভারতে—পশুর প্রয়োজন মিটে গেলে—অবসন্ন হয়ে যায় তাদের দেহ—ঝিমিয়ে আসে—তাদের মন। স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছাতে জানে না। সে রাজ্যে—নেই অবসাদ—নেই ক্লেদ—নেই নীচতা।

তাই অরুন্ধতী বল্‌ল, মানুষ ম'রে—সেজন্য বিশেষ কিছু দুঃখ নেই। কিন্তু একটা জাতির কল্পনাশক্তি মরে যাওয়া—সবাইর চাইতে বড়ো দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনার থেকে কে বাঁচাবে? স্থূল, ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলে—কল্পনার পাখা কে জুড়ে দেবে ?

অরুন্ধতীর এ প্রশ্নের পর, শশধরবাবুর মুখ হ'তে আর কিছু জোগাল না। তাই তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেবে গেলেন।

(১৩)

কয়েকদিন পর। অরুন্ধতী সকাল থেকেই ব্যস্ত। লোক-জনের সঙ্গে দেখা শুনো। অনেকেই এসেছিল গুরুমার সঙ্গে—শেষ দেখা কর্‌তে। অনাথ মোট-ঘাট বাঁধাছাদায় ব্যস্ত। দু'জন দু'দিকে চলেছে। অনাথ কলকাতায় নতুন ব্যবসা খুল্‌বে—আর অরুন্ধতী যাচ্ছে ঢাকাজেলার এক পাড়াগাঁয়ে। সেখানে তার কিছু জমি আছে—আর একটা ভাঙ্গা টিনের ঘরও আছে। সম্প্রতি বালিকা বিদ্যালয় সে ঘরটাতেই খুল্‌বে। এতদিন কেটেছে—অরুন্ধতীর গহনা আর জিনিষ পত্তোর বিক্রি কর্‌তে। হাজার কয়েক টাকা পেয়েছে—

যারাই দেখা কর্‌তে এসেছে—সবাই অবাক হয়েছে—তাদের আনন্দ উদ্ভাসিত মুখ দেখে। কে বল্‌বে—তারা সর্ব্বস্ব হারিয়ে,—ফতুর হয়ে সাহেবগঞ্জ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মনে হয়—এতো কালের পিঞ্জরারদ্ধ পাখি মুক্তি পেয়ে আকাশের বহুঊর্দ্ধে উড়্‌তে চলেছে। মর্ত্ত্যের লোক আর নাগাল পাবে না। তাদের যাত্রাপথে ঊর্দ্ধলোকে চেয়ে চেয়ে—তাদের চোখ ঝল্‌সে যাবে মাত্র।

রাত আট টায় ট্রেন। বিকেলের দিকে বাঁধাছাদা শেষ করে—সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে—ওরা দুজনায় চা-এর পট নিয়ে বস্‌ল।

চা খেতে খেতে অরুন্ধতী বল্‌ল, শিগ্‌গির শেষ ক'রে—চল বেরিয়ে পড়ি—

তখন চারটা বেজেছে—হাতে আরও চার ঘণ্টা সময় আছে।

অরুন্ধতী আবার বল্‌ল, এ চার ঘণ্টায় কোন কাজ নেই—কেবল ঘুরে বেড়াবো। জীবনে এমন চার ঘণ্টা আর পাওয়া যাবে না হাট্‌তে হাট্‌তে চল—গ্রামের দিকে চলে যাই—সেখানে আমাদের কেউ চেনে না—বুঝ্‌বে না। যাবে?

যেতে পার্‌লে আমি বেঁচে যাই। এ বাড়ীতে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। চল বেরিয়ে পড়ি—এমন ক'রে দু'জনে এক সঙ্গে চল্ল বুঝি আর সম্ভব হবে না—চল চল আর দেরী নয়।

অরুন্ধতী দরোয়নকে মালপত্র ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিতে বল্‌ল।

চা খেয়ে—ওরা বেরিয়ে পড়্‌ল।

শরতের গোধূলি নেমে এসেছে—গ্রামের বুকে। অনাথ আর অরুন্ধতী পাশাপাশি নিশব্দে হেটে চলেছে—গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দু'ধারে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। দিনান্তের ক্লান্ত রবি ডুবে যাচ্ছে—দিগন্তের পর পারে। দিনের কাজ শেষ করে সবাই চলেছে ঘরের পানে। ক্লান্ত তাদের গতি।

হঠাৎ অরুন্ধতী বল্‌ল, সে-দিন প্রথম চোখে পড়েছিল শরতের সকাল—আর কাল থেকে দেখ্‌ছি শরতের—সন্ধ্যা।

অনাথ বল্‌ল, তাতে কি মনে হোচ্ছে।

শরতের প্রভাতে মনে হয়েছিল তুমি আস্‌বে—আমার জীবনের যাত্রা সুরু হ'বে তোমায় নিয়ে। আজ দেখ্‌ছি বিদায়ের ছবি—ক্লান্ত রবি বিদায় নিচ্ছে। তুমি চলে যাবে—তোমার কর্ম্মময়

জীবনে—আমি চলে যাবো কাজ কুড়িয়ে নিতে। এম্‌নি ছাড়াছাড়ির জন্য তোমায় পাবো ভাব্‌তে পারিনি। কেন এলে জীবনের এই অবেলায় ?

জীবনের অবেলায়েই সাথীর প্রয়োজন। কর্ম্ম কোলাহলে তোমায় পেয়ে-ও এতো কাল পাইনি।

সেই কর্ম্ম-কোলাহলেই আমরা আবার ফিরে চলেছি। সে কোলাহলে তুমি পাবেনা আমায়—আমি পাবোনা তোমায়। আমাদের জীবনে কারো স্থান রইল না। ব্যব্‌সা হবে তোমার স্বপ্ন—তোমার ধ্যান-জপ-তপ—জীবনে এমন কোন ফাঁক থাক্‌বে না—সেখানে আমার স্থান হ'তে পারে। আমি তোমায় জানি—দেখছি তোমার কাজের নেশা। তোমার সে কাজের আবর্ত্তনে আজকের এ অরুন্ধতী ছিট্‌কে পড়্‌বে—তোমারই অজ্ঞাতে। তাই বলি—কেন দু'দিনের দেখাশুনো—কেন ঘর-বাঁধার স্বপ্ন। ক্ষণিকের সুখ—আমায় ফেলে দিয়ে যাবে—জীবনভর দুঃখে।

ভুল কর্‌লে অরুন্ধতী—মস্ত ভুল কর্‌লে। আজ্‌কের এটুকু সুখ-স্মৃতি তোমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌বে। এ হ'বে তোমার দুঃখের দিনে—সবাইর চাইতে বড়ো সম্বল। এ স্মৃতি তোমায় দেবে কর্ম্মপ্রেরণা। কাজের ভেতর দিয়েই আমরা বাঁচ্‌বো। আমি এ সত্য হৃদয়দিয়ে অনুভব করি। মাঝ ডাঙ্গায় যত সুখই থাকুক —সেটা টিক্‌বে না। যারা এসেছে কাজ করতে—তাদের কর্ম্মহীন জীবন হ'বে দুর্ব্বিসহ—তারা এমনি বাঁচতে পারে না। এটা বুঝ্‌তে চেষ্টা করো—ঘর বাঁধতে আমরা আসিনি। সবাই যা'তে ভাল করে ঘর বাঁধতে পারে—সে কাজের সহায় হ'তে আম্‌রা এসেছি। এ'টা ভগবানের বিধান—বিদ্রোহ করে লাভ নেই। তাতে কিছুই পাবেনা। নিজেও ঘর

বাঁধতে পারবেনা—অন্যকেও ঘর বাঁধতে সাহায্য করতে পারবে না। একবার ভাব দেখি—কত বড়ো কাজ নিয়ে—তুমি চলেছো। তুমি তৈরি করবে সব মেয়ে—যারা একদিন হ'বে ঘরণী—যারা হ'বে মা—যাদের হাতে গড়ে উঠবে জাতির ভবিষ্যৎ। এতো বড়ো কাজের দায়িত্ব নিয়ে তুমি চলেছো—এ ভাঙ্গা দেশের প্রাণে প্রাণে—সহরে সহরে। তোমার হাতে গড়া ঘরণীতে ঘর ভরে যাবে—তোমার হাতে গড়া মেয়েরা হ'বে সত্যিকার জননী। এ আনন্দে বিভোর হয়ে ভুলে যাও—নিজের ঘর বাঁধার স্বপ্ন—ভুলে যাও—নিজের অনাগত দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির কল্পনা।

এমন সময় ওরা দেখ্‌ল কে যেন দ্রুত সাইকেল চালিয়ে তাদের দিকে আস্‌ছে। ছেলেটি সাম্‌নে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল, আপনারা শিগ্‌গির চলুন—শশধরবাবু বুঝি—

ঐ পর্য্যন্ত বলে থেমে গেল।

অনাথ স্তম্ভিত। পরে বল্‌ল, গাড়ি আছে?

হ্যাঁ—মোটর একটু আগেই আছে। এ রাস্তায় কিছুতেই মোটর আনা গেলনা।

অরুন্ধতী ছেলেটীকে বল্‌ল, শিগ্‌গির চল—তুমি সাইকেলে চাপ।

তারপর অরুন্ধতী অনাথের হাত ধরে দৌড়তে লাগ্‌ল। জীবনে প্রথম দেখা হওয়ার দিনে—এমনি ক'রে একদিন তারা দু'জনায় দৌড়িয়েছিল। আজ বিচ্ছেদের দিনে ফের দৌড়াতে লাগ্‌ল। পেছনে পড়ে রইল মাঠ—গ্রাম—আর দিগন্তের ক্লান্ত রবি।

আগত জীবনে এম্‌নি করেইতো—তাদের ছুটতে হবে। পশ্চাতে পড়ে থাকবে সমাজ—সংস্কার—আর সুখ-ভোগ।

অনাথ আর অরুন্ধতী যখন গিয়ে পৌঁছাল—তখন প্রায় সব শেষ হ'য়ে এসেছে। শশধরবাবু অরুন্ধতীর হাতখানা কোন রকমে তুলে নিয়ে 'উইলখানা' দিয়ে বল্‌লেন, এবাড়ীতে তুমি থেকো—স্কুল ক'রো—

অনাথকে ইসারায় ডেকে—অরুন্ধতীকে দেখিয়ে কি যেন বল্‌তে চাইলেন। শুধু ঠোঁট নড়ে উঠ্‌ল—তারপর আর কোন কথা কিছু বোঝা গেল না।

কান্নার রোল উঠ্‌লনা—লোকজনের ছুটো-ছুটি পড়লনা—ডাক্তাররা ভীড় কর্‌বার সুবিধে পেলনা। হঠাৎ 'এপোপ্লেক্‌সির' আক্রমণে দু' ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে গেল। অরুন্ধতী শশধরবাবুর শবদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে অনাথ দাহকার্য্য শেষ করে বাড়ী ফিরে দেখে অরুন্ধতী শশধরবাবুর ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। সারা রাত অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল। শেষ রাতে বেহারী ঐ অবস্থায় দেখে—জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। এতোক্ষণ চোখ বুজে ছিল। অনাথের ডাকে একবার চোখ খুলেই—আবার চোখ বুজ্‌লো। অনাথ অরুন্ধতীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলনা। দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দেবার জন্যে—যার ডাক সবাইর আগে পর্‌তো—সে আজ শোকগ্রস্থা। তাকে বোঝাবার ভার কে নেবে? অনাথও সাহস পেলনা।

বিকেলের দিকে অরুন্ধতী সুস্থ হ'ল। অনাথ চলে যাচ্ছে—সন্ধ্যের গাড়ীতে। অরুন্ধতীর যাবার যো নেই। কাকাবাবুর শেষ অনুরোধ—সে যেন এবাড়ীতেই স্কুল বসায়। কাজেই এ বাড়ী ছেড়ে—তার ছুটি হ'ল না।

অনাথের বিদায় নেবার সময় অরুন্ধতী বল্‌ল, 'তোমরা সবাই চলে গেলে—আমায় একা ফেলে! আমি বাচবো কি করে?—

অনাথ বল্‌ল কাজ—যে কাজের ভার কাকাবাবু তোমার ওপর দিয়ে গেলেন—তাই নিয়ে কাট্‌বে তোমার জীবন—

অরুন্ধতী বল্‌ল, যদি কখনও টাকার অভাব মনে করো—আমায় জানাবেতো? কাকাবাবু প্রায় আশি হাজার টাকা রেখে গেছেন এতো টাকা দিয়ে আমি কি কর্‌বো?

ঐ আশিহাজার থেকে এক পয়সাও আমি নিতে পার্‌বো না। ও টাকা দেশের মেয়েদের—তাদের শিক্ষায় খরচ কর্‌বে। আমার নেবার কোন অধিকার নেই।

কাকাবাবু টাকা আমাকেই দিয়ে গেছেন।

তোমায় দেননি—দিয়েছেন তোমার কাজকে। বলতে বলতে অনাথ গাড়িতে উঠ্‌লো।

আমার নিজেরও টাকা আছে।

সে কথা অনাথ শুন্‌তে পেল কিনা বোঝা গেল না।

গাড়ী চলে গেল। অনাথের গাড়ী অনেকক্ষণ হয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ী এসেছে—অনেক গাড়ী চলে গেছে—অসংখ্য লোক চলাফেরা করেছে। ফেরিওয়ালা ডেকে গেছে—ভিকিরি ভিক্ষা কর্‌তে কর্‌তে চলে গেছে। মোটর রাস্তাটা ধূলোয় অন্ধকার ক'রে চলে গেছে। বাতাস বয়ে গেছে—দূরের দেবদারু গাছ থেকে পাখি ডেকেছে—বাতাসে পাতা ঝরে পড়েছে—কত কি হয়েছে—এ চলাচল সংসারে। আর অরুন্ধতী সে পথে দাঁড়িয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে—যেদিকে অনাথের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে॥

সমাপ্ত

পাঠক ও পাঠিকাগণ—

অন্তর্জাতি পরিস্থিতির জন্য বইটা তাড়াতাড়ি ছাপাইতে হইয়াছে সেজন্য কিছু ভুল হইয়া গিয়াছে। নিম্নে অশুদ্ধ ও শুদ্ধ পৃষ্ঠা ও লাইনের পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৪	হাতেড়গা	হাতেগড়া
৩২	১৪	গোঁশালা	গোশালা
৩৪	১৪	সে হ'তে	সেই থেকে
৩৪	১৭	কৃয়া	ক্রিয়া
৩৭	১৩	মালীককে	মালিককে
৩৮	১৩	তাঁহাকে	তাকে
৪১	১	সে	তিনি
৪১	২	ছিল	ছিলেন
৪১	১৩	পরছে	পড়ছে
৪২	৪	অনন্ত	অনন্ত
৪২	৫	অনন্ত	অনন্ত
৪৩	১৯	বিংশসতাব্দী	বিংশশতাব্দী
৪৪	৮	হাড়িয়ে	হারিয়ে
৪৪	১২	হ'তে	থেকে
৪৫	৯	হ'তে	থেকে
৪৫	১৪	অচিন্ত	অচিন্ত্য
৪৬	৫	কাঁটিয়েছে	কাটিয়েছে
৪৬	৮	করছিলেন	করছিল

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭	১৬	বন্দবস্ত	বন্দোবস্ত
৪৮	১	সন্ধায়	সন্ধ্যায়
৪৯	২০	হাটবার	হটবার
৫০	১	পরম-গুরুর-মাহাত্ব	পরম গুরুর মাহাত্ম্য
৫০	৫	কল্যানই	কল্যাণই
৫০	৭	কল্যান	কল্যাণ
৫১	৩	হাড়িয়ে	হারিয়ে
৫৪	১২	ভীর	ভীড়
৫৪	১৪	বেরাচ্ছে	বেড়াচ্ছে
৫৪	১৮	স্বাচ্ছন্দ	স্বাচ্ছন্দা
৫৬	১৭	মুখরীত	মুখরিত
৫৬	২০	মিমাংসার	মীমাংসার
৫৬	২৩	ভাড়ী	ভারী
৫৭	৩	রক্তৃতার	বক্তৃতার
৫৮	১০	অরুন্ধতীর	অরুন্ধতী
৫৮	১১	মিমাংসা	মীমাংসা
৫৮	১৩	রূদ্ধ	রুদ্ধ
৫৮	১৭	রাশী	রাশি
৬১	১৩	ছারপত্র	ছাড়পত্র
৬১	১৬	উপলব্দি	উপলব্ধি
৬২	২	অনির্ব্বচনীর	অনির্ব্বচনীয়
৬২	৫	বিকসিত	বিকশিত
৬২	৭	স্পর্ষে	স্পর্শে

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	১৮	পরষ্পরের	পরস্পরের
৬৩	৫	মঙ্গলাকাঙ্খা	মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা
৬৩	২০	কূলবধুবা	কুলবধূরা
	২১	পাসে	পাশে
৬৪	২১	ভীর	ভীড়
৬৪	৩	ঘণ্টার	ঘণ্টা
৬৬	২	সভাপতিত্বের	সভাপতিত্বের
৬৭	১	তারা	তাঁরা
	২	গঁড়ে	গড়ে
	১১	পরস্পরায়	পরম্পরায়
	১৪	হতাস	হতাশ
৬৮	৫	দায়িত্ব	দায়িত্ব
	১০	ওপর ভর ক'রে।	ওপর ভর করে ?
	১৭	বিকাসের	বিকাশের
	১৮	তাকেয়ে	তাকিয়ে
৭০	৪	সঙ্কা	শঙ্কা
৭৩	২২	বিবস	বিবশ
৭৪	৩	অস্তিত্বের	অস্তিত্বের
	১৪	অত্যান্ত	অত্যন্ত
	১১	উহাতে	তা'তে
	২৪	নির্ভূল	নির্ভুল
৭৬	১২	বিজাণু	বীজাণু
	১৪	পরষ্পর	পরস্পর

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯	১৮	তারা যাহা	তাঁরা যা'
	১৮	কেহ	কেউ
	২৩	পুর্ণস্থাপিত	পুনরুদ্ধার
৮০	১৮	মিমাংসা	মীমাংসা
৮১	৫	সেড়ে	সেরে
৮৫	২	দীগন্ত	দিগন্ত
	৫	মিসেছে	মিশেছে
৮৬	৭	মিমাংসশা	মীমাংসা
	২০	হ'য়ে ওঠল ?	হ'য়ে উঠ্‌ল ?
৮৭	৪	ধর্ম্মহানী	ধর্ম্মহানি
৮৮	৭	আত্মিয়	আত্মীয়
	১৬	হুলুধ্বনী	হুলুধ্বনি
৮৯	৯	মৃত্যের	মৃত্যুর
	১৯	মাড়ামাড়ির	মারামারির
	২২	অশ্লিল	অশ্লীল
৯০	১৫	অপরাধির	অপরাধীর
৯১	২৩	দায়িত্ব	দায়িত্ব
৯৩	১	গ'রে	গ'ড়ে
৯২	১৮	দুর্স্বপ্ন	দুঃস্বপ্ন
৯৪	১	পড়েনা	×
	২১	তপশ্বিনীর	তপস্বিনীর
৯৫	১৭	বেরিযে	বেরিয়ে
৯৬	১৮	নেও	নাও
		বাচা	বাঁচা

আগামী সংখ্যায় সংশোধিত হইবে।